দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্যচর্চা

সপ্তম শতাব্দী থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তর পর্যন্ত প্রায় এগারোশ বছর এই জেলাঞ্চল এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তারপর এ জেলা সাধারণ এক মফঃস্বল জেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ এই দুই পর্বের জেলাঞ্চলের সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয় দেওয়া এই রূপরেখার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার একদিকে রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ নগর সংস্কৃতি, পাশাপাশি গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারা। এ জেলাতে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার এবং কাশিমবাজার, লালগোলা ও কান্দীর রাজপরিবার সাহিত্য সংস্কৃতির বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আঠার শতকের গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে লেগেছিল ভাঁটার টান। একথা অনস্বীকার্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা ছিল বৈষ্ণব সাহিত্য। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ছিলেন তার প্রাণপুরুষ। বৈষ্ণবধর্ম বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় যে জোয়ার এনেছিল এ জেলায় তা পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হয়েছিল। এ জেলায়ও মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান ধারা বৈষ্ণব সাহিত্য। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এ জেলার বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার হয়েছিল প্রধানত তিনটি কেন্দ্র থেকে জিয়াগঞ্জ - ভগবানগোলা, বহরমপুর শহরের সৈদাবাদ ও বুধুইপাড়া, জেলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমানায় বর্ধমান লাগোয়া ভরতপুর থানার মালিহাটি - কাঞ্চনগড়িয়া। বৈষ্ণব পদকর্তা ও সাধকের বড় অংশ আবির্ভূত হয়েছিল এই সব অঞ্চলের আশেপাশে। পাশাপাশি এ জেলার বুকে মুসলমান শাসন প্রদেশের অন্যান্য অংশের মত স্থিতিশীল হলে সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

এ জেলায় বহু বৈষ্ণব পদকর্তা, বৈষ্ণব গ্রন্থ রচয়িতা, ভাষ্যকার ও বৈষ্ণব গ্রন্থের টীকাকার জন্ম নিয়েছিলেন অথবা জীবনের একটা বড় সময় অতিবাহিত করেছিলেন। চৈতন্য-পার্শ্বচর গদাধর গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র, বৈষ্ণব দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশের যদুনন্দন দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবি ও গ্রন্থকারদের আবির্ভাব এ জেলায়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের জন্ম এ জেলায় না হলেও ভগবানগোলার কাছে তেলিয়া বুধুরী গ্রামে তাঁর জীবনের বেশী সময় কেটেছিল এবং সেখানেই তাঁর দেহান্ত হয়। ত্রিপুরারাজের সহায়তায় বহরমপুরে যে রাধারমণ প্রেস স্থাপিত হয়েছিল সেখানে প্রচুর বৈষ্ণব গ্রন্থ ছাপা হয়। বাংলার মুসলমান ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'সিয়ার-উল্- মুতাক্ষরীণ' এর লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন মুর্শিদাবাদ নগরের বাসিন্দা ছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'গীতকল্পতরু' বা 'পদকল্পতরু' সংকলক গোকুলানন্দ সেন, কৃষ্ণকান্ত দাস, রঘুনাথ দাস, সৈয়দ মর্তুজার মত বৈষ্ণব সাধক, পদকর্তারা এ জেলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন।

'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত গোবিন্দদাস কবিরাজের বাস ছিল তেলিয়া বুধুরী গ্রামে। বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই পদকর্তা 'সঙ্গীত মাধব' নামে একটি সংস্কৃত নাটক এবং অষ্টকালীর একান্নপদও রচনা করেন।

বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জন্ম নদীয়া জেলার দেবগ্রামে ১৬৫৪ সালে। তাঁর রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের টিকা বৈষ্ণব সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত। বহু বৈষ্ণব পদ ও তত্ত্বগ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তাঁর সংকলিত 'ক্ষণদা গীতচিন্তামণি' বৈষ্ণব পদ সংকলনের আদিগ্রন্থ। বৈষ্ণব ভক্তকবি নরহরি চক্রবর্তী রচিত পদের সংখ্যা ১৩৫টি। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্রের পুত্র রাধামোহন ঠাকুরের আবির্ভাব ভরতপুর থানার মালিহাটি গ্রামে আঠার শতকের গোড়ায়। 'মহাভাবানুসারিণী' নামে একটি টীকাগ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

সতের আঠার শতকে যে সব বৈষ্ণব কবি, সাধক, টীকা-ভাষ্যকার এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উদ্ধব দাস, কৃষ্ণকান্ত দাস, গোপীরমণ চক্রবর্তী, জয়গোপাল দাস, দ্বিজ হরিদাস, যদুনন্দন দাস ঠাকুর, শ্রীদাম দাস, লোচনদাস প্রমুখ। মুসলমান বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তাদের মধ্যে নাসির মাহমুদ, সৈয়দ মর্তুজা অন্যতম। সৈয়দ মর্তুজা জঙ্গীপুরের কাছে ছাপঘাটিতে বাস করতেন। তাঁর রচিত কয়েকটি পদ এখনও গীত হয়। চৈতন্যোত্তর যুগের বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ কবি বলরামদাস এর জন্ম গোয়াসে। লোচনদাস ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতার বাস ছিল সৈদাবাদের বিপরীতে গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে। এই মহিলা বৈষ্ণব গ্রন্থকারের রচিত 'হাটপত্তন' (টীকা) ও 'মানবিলাস' উল্লেখযোগ্য।

'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান ঝামটপুর। একসময় এই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সৈদাবাদের গোপালদাস রচনা করেছিলেন 'রাধাকৃষ্ণ রসকল্পলতা'। বিনাইপুরের গঙ্গাধর দাস কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্যকথা বর্ণনা করে 'কিরীটি মঙ্গল' রচনা করেছিলেন। গৌরসুন্দর দাসও 'কীর্ত্তনানন্দ' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম দাস থাকতেন তেলিয়া বুধুরীতে। 'গোবিন্দরতি মঞ্জরী' নামে সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে একটি বই তিনি রচনা করেন। তেলিয়া বুধুরীর আরেক বৈষ্ণব সাধক দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ 'জয়দেব প্রসাদাবলী' অনুবাদ করেছিলেন। পাণিশালার শ্রী নরহরি দাস চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তম বিলাস', 'শ্রীনিবাস চরিত', 'ছন্দসমুদ্র', গ্রন্থগুলি রচনার পাশাপাশি 'লীলা সমুদ্র' এবং 'গীত চন্দ্রোদয়' নামে দুটি গ্রন্থ সংকলন করেন। 'রসকলিকা' ও 'বৃন্দাবন লীলামৃত' গ্রন্থদুটির লেখক ছিলেন চুনাখালির নন্দকিশোর দাস। এ জেলা থেকে এই সময় বেশ কয়েকখানি বৈষ্ণব পদসংকলন প্রকাশিত হয়। রাধামোহন ঠাকুরকে এ ধরণের সংকলন গ্রন্থের পথপ্রদর্শক বলা যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্রের পুত্র রাধামোহন ঠাকুরের আবির্ভাব ভরতপুর থানার মালিহাটি গ্রামে আঠার শতকের গোড়ায়। নিজের সংকলিত 'পদামৃত সমুদ্র' গ্রন্থে তিনি এ জেলার আরেক বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্তুজার পদ সংকলিত করেছিলেন। 'মহাভাবানুসারিণী' নামে একটি টীকাগ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

গোবিন্দদাস কবিরাজের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ থাকতেন তেলিয়া বুধুরি গ্রামে। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সমাজের নেতা ও গুরুস্থানীয় রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র বাংলা ও সংস্কৃত দুই ভাষাতে কাব্য রচনা করেছিলেন। মল্লরাজ বীর হাম্বির তাঁর কাছে বৈষ্ণবতত্ত্বে পাঠ নেন। পদকর্তা রামচন্দ্র 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা', 'স্মরণ দর্পণ', 'বঙ্গজয়', 'সাধন চন্দ্রিকা' গ্রন্থ রচনা করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর আমিন, বহু ভাষাবিদ রঞ্জিত রায় 'চিচ্‌তান্ কেতাব' নামে একটি দোহাকোষ সংকলন করেন। সৈদাবাদের রূপ কবিরাজ 'সার সংগ্রহ' নামে বৈষ্ণবতত্ত্বের একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। ষোড়শ শতকের পদকর্তা লোচনদাসের জন্ম কাগ্রামে। 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে একটি জীবনীগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'দুর্লভসার', 'চৈতন্য বিলাস', 'বস্তুতত্ত্ব সার', 'আনন্দলতিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বৈষ্ণব শাস্ত্রের টীকাভায্যের পাশাপাশি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেন। তাঁর টীকাগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'চৈতন্য চরিতামৃত', 'ব্রহ্ম সংহিতা', 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা', 'সারার্থদর্শিনী', 'সারার্থবর্দ্ধিনী' প্রভৃতি ও 'ক্ষণদা গীতচিন্তামণি', 'গৌরগণ চন্দ্রিকা', 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা'-র মতো প্রায় ৪৫টি গ্রন্থ।

মধ্যযুগের সাহিত্য চর্চার এই ধারা ঊনিশ শতকেও বহমান ছিল। এ জেলার লেখকেরা নানা প্রয়াস চালিয়েছেন গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে। এ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলি এ জেলার সাহিত্য পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকাকালীন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় থাকতেন খাগড়ায়। 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর এই সাহিত্যিকের 'উদভ্রান্ত প্রেম' উপন্যাসটি সে সময় পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। এছাড়াও 'স্ত্রীচরিত্র', 'মশলাবাঁধা কাগজ', 'কুঞ্জলতার মনের কথা', 'সারস্বত কুঞ্জ' গ্রন্থগুলি তাঁর রচিত।

বিভূতিভূষণ ভট্ট-এর উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'স্বেচ্ছাচারী', 'আশা', 'সপ্তপদী'। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এ জেলার সন্তান। তাঁর রচিত উপন্যাস হ'ল 'অসীম', 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', 'করুণা', 'ময়ূখ', 'ধ্রুবা' প্রমুখ। কল্লোল যুগের কবি মণীশ ঘটক রচনা করেছিলেন 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' গল্প গ্রন্থ এবং 'কনখল' উপন্যাস। ঔপন্যাসিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীর জন্ম মালিহাটিতে। 'কালোঘোড়া', 'ক্ষণবসন্ত', 'গৃহকপোতী', 'আকাশ ও মৃত্তিকা', 'হংস বলাকা', 'ময়ূরাক্ষী', নতুন ফসল', 'শতাব্দীর অভিশাপ', 'সোমলতা', 'মহাকাল', 'নাগরী', 'বসন্তলহরী', 'মধুচক্র', 'ঘরের ঠিকানা' প্রভৃতি উপন্যাস সরোজ কুমারের। খড়গ্রাম থানার মহিষার গ্রামের হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'মুমূর্ষু পৃথিবী' উপন্যাসটি বাঙালী পাঠককে আলোড়িত করেছিল। তাঁর লেখা আরও দুটি উপন্যাস হ'ল 'অস্তাচল' এবং 'অভিমান'।

'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদার ঝুলি' খ্যাত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার দীর্ঘদিন মুর্শিদাবাদে ছিলেন এবং রূপকথা ইত্যাদি সংগ্রহের পাশাপাশি 'খোকাবাবুর খেলা', 'চারু ও হারু', 'উৎপল ও রবি', 'ফাস্ট বয়', 'লাষ্ট বয়' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এ জেলার মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য নিরুপমা দেবীর বাস ছিল বহরমপুরে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'দিদি', 'বিধিলিপি', 'উচ্ছৃঙ্খল', 'শ্যামলী', 'বন্ধু', 'পরের ছেলে', 'দেবত্র', 'যুগান্তরের কথা', 'অনুকর্ষ' উল্লেখ্য। বহরমপুর শহরের আরেকজন মহিলা ঔপন্যাসিক সুষমা সিংহ লিখেছিলেন 'বাজীওয়ালী' নামে একটি উপন্যাস। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী কাঞ্চনমালা দেবী 'বাসর ডায়েরী', নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। নিরুপমা দেবী ও কাঞ্চনমালা দেবী বিভিন্ন সাহিত্য

পত্রিকাগুলিতে গল্পও লিখেছিলেন। সাটুই-এর ইন্দ্রাণী দেবীও গ্রন্থ রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। পাঁচথুপির ইন্দুমতী ঘোষ মৌলিক লিখেছিলেন 'বঙ্গনারীর ব্রতকথা'- যা জার্মান ভাষাতে অনুদিত হয়েছিল। 'ভাগ্যচত্র(', 'স্বপ্নদ্রষ্টা' প্রভৃতি উপন্যাসের স্রষ্টা নু(ন্নেসা খাতুন।

'শিকার কাহিনী'র লেখক লালগোলার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় লিখেছিলেন 'চিরন্তনীর জয়' নামে একটি উপন্যাস। মুর্শিদাবাদ শহরের বাসিন্দা অ(ণ ভট্টাচার্য্য রচিত 'আজকের নায়ক নায়িকা' উপন্যাসটি এবং 'নাগিনীর মন' গল্প গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য।

নিজের বিপ্‌-বী জীবনের স্মৃতি মিশিয়ে জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী রচনা করেছিলেন 'বিপ্‌-বের তপস্যা', 'নমামি', 'মেঘ ডাকে', 'পথের পরিচয়', 'উঁচু নীচু' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি।

'অরণ্যের অধিকার', 'হাজার চুরাশীর মা' ইত্যাদি অজস্র গ্রন্থের রচয়িতা মহা(েতা দেবী এই জেলার গৌরব। 'অলীক মানুষ' খ্যাত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' খ্যাত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ফুলবউ' খ্যাত আবুল বাসার বা 'কাছের মানুষ' খ্যাত সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যও এ জেলার মানুষ। এদের প্রত্যেকেই বহু গ্রন্থের রচয়িতা। নজ(ল ইসলাম এই তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন। গুণময় মান্না জেলায় বসেই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সাহিত্য সাধনা।

কবিতা রচনার (েত্রে এ জেলায় অগ্রগণ্য নাম 'যুবনা(' খ্যাত মণীশ ঘটক। তাঁর 'শিলালিপি', 'যদিও সন্ধ্যা', 'বিদূষী বাক', 'নামায়ন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'যুবনা(ের নে(দা' নামে অনুবাদ কাব্য উল্লেখযোগ্য। 'কল্লোলে'র এই কবি 'মান্ধাতার বাবার আমল' নামে একটি স্মৃতিকথাও রচনা করেছিলেন। এ জেলার কবিতা চর্চার ধারা আলোচনায় উল্লেখযোগ্য জঙ্গীপুরের কবি বিষু(পদ রায় সরস্বতী, তাঁর 'পুনর্নবা', 'বিরহী মাধব', 'দেবী বিষু(প্রিয়া' কাব্যগ্রন্থের জন্য। কান্দীর পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'রেণুকা', 'ভূমা' কাব্যগ্রন্থ। জেমো - কান্দীর অজয়েন্দু নারায়ণ রায় 'রামেন্দ্রসুন্দর' নামে একটি জীবনীগ্রন্থ রচনার পাশাপাশি কবিতাচর্চাও করেছেন। জেলার ইতিহাসচর্চার বিশিষ্ট ব্যত্তি(ত্ব কমল বন্দোপাধ্যায়ও 'মানসীকে' 'প্রিয়াকে' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। গোকর্ণ গ্রামের বীরে(ের মুখোপাধ্যায় 'দেহলী', 'শেষ পাণ্ডুলিপি' নামে কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। সালারের মহম্মদ হোসেন, খাগড়ার মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ভারততাত্ত্বিক রামদাস সেন প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি যে কবিতা গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিলাপতরঙ্গ', 'কুসুমমালা', 'তত্ত্বসংগীতলহরী' ও 'চতুর্দশ পদী' প্রভৃতি। 'মুর্শিদাবাদ বন্দনা'র কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং প্রাবন্ধিক জগদানন্দ বাজপেয়ী কবিখ্যাতি পেয়েছিলেন। শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হ'ল 'পদ্মরাগ', 'বাংলার বাঁশী', 'হোমাগ্নি', 'নির্মাল্য', 'ছন্দা' ইত্যাদি। মনীষীমোহন রায়, বিমল চত্র(বর্তীও কবিখ্যাতি পেয়েছিলেন। কবিতার জগতে আজো সৃষ্টিশীল উৎপল কুমার গুপ্ত।

উনিশ শতক থেকে বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক এ জেলায় আবির্ভূত হয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। বিজ্ঞান, দর্শন থেকে শু(করে ব্রতকথা, ধ্বনিতত্ত্ব পর্যন্ত নানা ধরণের প্রবন্ধের তিনি জনক। 'শব্দকথা', 'কর্ম্মকথা', 'জিজ্ঞাসা', 'নানাকথা', 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ', 'জগৎ কথা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রামদাস সেন বাংলা ভাষায় বুদ্ধদেব-এর প্রথম জীবনীকার। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'মহাকবি কালিদাস', 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা', 'ঐতিহাসিক রহস্য', 'ভারত রহস্য', প্রভৃতি। কলকাতার চিড়িয়াখানার প্রথম বাঙালী অধিকর্তা রামব্রহ্ম সান্যালের জন্ম মহুলা গ্রামে। তিনি বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি বিষয়ে কয়েকটি ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করেন। পুরাতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন দুই খণ্ডে 'বাংলার ইতিহাস', 'পাষাণের কথা', 'প্রাচীন মুদ্রা', 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস', 'ভুমারার শৈব মন্দির', 'লুৎফন্নেসা', 'বাঙালীর ভাস্কর্য' এবং প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি ইংরাজী বই। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এর জন্ম বহরমপুর শহরে। 'মনোময় ভারত', 'ত(ণের ভারত', 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য', 'শি(া সেবক', 'বি(ভারত' (২ খণ্ড), 'পল্লী প্রচারক' প্রভৃতি বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থ এবং অর্থনীতি সমাজনীতির ওপর কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থের তিনি লেখক। তাঁর ভাই রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও এই জেলার একজন অতি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - অখন্ডভারত, লোকাল গভর্ণমেন্ট ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, ন্যাশনালিস্‌ম ইন হিন্দু কালচার প্রভৃতি। বহরমপুর টোলের অধ্য(এবং বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মের প্রবত্ত(া শশধর তর্কচূড়ামণি ছিলেন কাশিমবাজার রাজাদের সভাপণ্ডিত। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'বেদব্যাস', 'ধর্মব্যাখ্যা', 'সাধন প্রদীপ', 'ভবৌষধ', 'দুর্গোৎসব পঞ্চক', 'চূড়ামণি দর্শন', নামে বেদ বিষয়ে ইংরাজী মতের প্রতিবাদ প্রভৃতি। 'শিল্পের গল্প' প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা শিল্পী মণিমোহন রায় চৌধুরী('কান্তনামা' গ্রন্থের লেখক মানুল্লা মণ্ডল প্রাবন্ধিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র এ জেলা ছেড়ে চলে যাবার পর চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমালোচক' পত্রিকায় বহরমপুর স্থিত 'বঙ্গদর্শন' এর লেখকরা লিখতে থাকেন। চন্দ্রশেখর এরপর 'উপাসনা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন যেখানে বিশিষ্ট

লেখক প্রাবন্ধিক নিখিলনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ লিখতে থাকেন। এ জেলায় প্রবন্ধকার হিসাবে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন ব্রজভূষণ গুপ্ত, নলিনাক্ষ সান্যাল, রেজাউল করীম, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ বাজপেয়ী, শশাঙ্কশেখর সান্যাল, ত্রিদিব চৌধুরী নির্মাল্য বাগচী, গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, বিমলচন্দ্র সিংহ প্রমুখ। এ জেলার প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ব্রজভূষণ গুপ্তের 'জীবনকথা' সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস হয়ে উঠেছে। কান্দীর বিমলচন্দ্র সিংহ ভীষ্মদেব খোসনবীশ (জুনিয়র) ছদ্মনামে সাময়িক পত্রে লেখার পাশাপাশি 'বাংলার চাষী', 'দেশের কথা', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'বিশ্বপথিক বাঙালী', প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

এ জেলার প্রাবন্ধিকদের একাংশের মধ্যে মুর্শিদাবাদ চর্চা অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। গোয়াসের শ্যামধন মুখোপাধ্যায়-এর লেখা 'মুরশিদাবাদের ইতিহাস'- বাংলার প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস। নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এই ইতিহাস সম্পৃক্ত। পাঁচথুপির শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঁচ খণ্ডে 'মুর্শিদাবাদের কথা' রচনা করেন। মুর্শিদাবাদ শহরের পূর্ণচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন নবাবী আমলের কাহিনী 'মসনদ অব্ মুর্শিদাবাদ', মুর্শিদাবাদ চর্চার এই ধারা আজও অব্যাহত। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'বন্দর কাশিমবাজার', 'লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ অব্ কান্তবাবু', 'দি হিস্ট্রি অব্ কাশিমবাজার রাজ', বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ, মুর্শিদাবাদ', 'প্রাচীন মুর্শিদাবাদ, কর্ণসুবর্ণ ও মহীপাল', সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্তের 'চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত' এই ধারারই উজ্জ্বল নির্দর্শন। শক্তিনাথ ঝা, পুলকেন্দু সিংহ, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, বিষাণ কুমার গুপ্ত প্রমুখেরাও এই ধারাতে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা।

নাটক রচনায় অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব জিয়াগঞ্জের বিধায়ক ভট্টাচার্য। 'ক্ষুধা', 'সেতু', 'মেঘমুক্তি', 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে', ইত্যাদি নাটকের তিনি স্রষ্টা। কাশিমবাজার রাজপরিবারের শ্রীশচন্দ্র নন্দীও নাট্যকার হিসাবে খ্যাত। 'দস্যু দুহিতা', 'মনোপাখী' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীও নাট্যকার হিসাবে খ্যাত। কান্দী জেমো অধিবাসী সরসীমোহন রায় যেমন 'তড়িৎপর্ণা' নামে একটি নাটক রচনা করেন, তেমনি সতীশচন্দ্র সিংহ 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। খাগড়ার সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যও নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন, 'পাঁচ বছর পরে' নাটক রচনা করে। বশীর আল হেলাল্ 'স্বর্গের সিঁড়ি' নাটকটির রচয়িতা।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের এক উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ্ক জঙ্গীপুরের দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তাঁর অনুগামী পণ্ডিচেরী খ্যাত নলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' জীবনীগ্রন্থটিও অসাধারণ সাহিত্যগুণ সমন্বিত।

পত্র পত্রিকা

মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকাটি হ'ল 'মুর্শিদাবাদ নিউজ'। ইংরাজী ভাষার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটির আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এটি শুধু যে মুর্শিদাবাদের প্রথম পত্রিকা তা নয়, এটি বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের মফঃস্বল এলাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে প্রথমতম।[১] কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ নিউজ-এর সম্পাদক ছিলেন স্টিফেন উইলিয়াম ল্যাম্ব্রিক। কিন্তু এ পত্রিকা দীর্ঘায়ু হয় নি। ১৮৩৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত চলার পর প্রশাসন কাগজটি বন্ধ করে দেয়। জেলার প্রথম বাংলা সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় ১৮৪০ সালের ১০ই মে। রাজা কৃষ্ণনাথের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত ও গুরুদয়াল চৌধুরী সম্পাদিত সেই সাপ্তাহিকটির নাম ছিল 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'। ১৮৪১ সালের ১০ই এপ্রিলের 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকা থেকে জানা যায় যে স্থানীয় প্রশাসনের বিরাগভাজন হওয়ায় প্রশাসন এই কাগজটির প্রকাশনাও বন্ধ করে দেন।

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'র অকালমৃত্যুর পর বছর কুড়ি জেলা থেকে আর কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নি। ১৮৬২ সালে আজিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বি(েমনোরঞ্জন'। নবকিশোর সেনের এই পত্রিকা ছাপা হ'ত তাঁর আজিমগঞ্জস্থিত 'ধনসিন্ধু' যন্ত্রালয় (ছাপাখানা) থেকে। ১৮৬৩ সালে আজিমগঞ্জ থেকেই নবকিশোর সেন বের করেন আরেকটি পত্রিকা 'ভারতবন্ধু'।[২] ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয় 'ভারতরঞ্জন' নামে একটি পত্রিকা। কেউ কেউ মনে করেন যে 'বি(েমনোরঞ্জন' এবং 'ভারতবন্ধু' পত্রিকা দু'টি একীভূত হয়ে 'ভারতরঞ্জন' আত্মপ্রকাশ করে। ১২৭১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় মন্তব্য করা হয়েছিল 'পত্রিকা দুখানির পরিবর্তে একখানি হইয়াছে এক্ষণে উত্তমরূপে চলিতে পারে।' কিছুদিন পর 'ধনসিন্ধু যন্ত্রালয়' নামের ছাপাখানাটি আজিমগঞ্জ থেকে বহরমপুরে উঠে আসে এবং বহরমপুর থেকেই ভারত রঞ্জন প্রকাশিত হতে শুরু করে। ডঃপার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভারতরঞ্জন পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ২৫০-এর বেশী ছিল।

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদসার' নামে আরেকটি পাক্ষিক পত্রিকাও ধনসিন্ধু প্রেস থেকে ছাপা হ'ত। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ৭ই জানুয়ারী (১৮৬৭) সংখ্যার একটি সংবাদ দেখে বিশিষ্ট গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন 'খুব সম্ভব ১৮৬৬ সনের ডিসেম্বর

(পৌষ ১২৭৩) মাসে’ পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে।

তবে এগুলো সবই সংবাদপত্র। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র ‘সমালোচনী’। বহরমপুরের সত্যরত্ন যন্ত্র (প্রেস) থেকে প্রচারিত এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৮৬৮ সালে (বৈশাখ ১২৭৫)। মূলতঃ বিশ্লেষণ মূলক লেখা এই পত্রিকাতে ছাপা হ’ত। ১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাসে (মাঘ ১২৭৬) প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা ‘মধুকরী’। বহরমপুরের সত্যরত্ন যন্ত্র থেকে প্রচারিত এই পত্রিকার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল ‘দেশের হিতসাধন ও বিদ্বৎমণ্ডলীর মনোরঞ্জন’। তিন মাস চলার পর ১২৭৭ সানের ১লা বৈশাখ থেকে পত্রিকাটি পাক্ষিক হিসাবে বের হতে থাকে। এই পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন নবকিশোর সেন। ১৮৭২ সালে বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে আর একটি নতুন কাগজ ‘মুর্শিদাবাদ পত্রিকা’। মূলতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী ছিল এই নতুন পত্রিকার উপজীব্য বিষয়। ১৮৭৩ সালে (ভাদ্র ১২৮০) পূর্বোক্ত ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় থেকে নবকিশোর সেনের সম্পাদনায় বের হয় নতুন সংবাদ সাপ্তাহিক ‘সমবেদক’। ১৮৭৪ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে বের হয় দুটি নতুন পত্রিকা ‘সহোদর’ (ভাদ্র ১২৮১) এবং ‘উচিৎ বক্তা’ (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪)। ‘সহোদর’-এর সম্পাদক ছিলেন অনুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাসিক এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হ’ত মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে। দ্বিতীয় পত্রিকাটি গঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশের সম্পাদনায় আজিমগঞ্জের বিদ্যাবিনোদ যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত হ’ত।

১৮৭৫ সালেও মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় তিনটি নতুন পত্রিকা। ‘বিনোদিনী’ নাম্নী মাসিক পত্রিকাটির প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং এই পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর বন্ধু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্ত। নসীপুর থেকে প্রকাশিত (প্রথম প্রকাশ-বৈশাখ ১২৮২) এই পত্রিকাটিতে ভুবনমোহনী দেবীর নাম সম্পাদক হিসাবে ছাপা হওয়ায় অনেকে এটিকে মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা বলে উল্লেখ করেছেন। ভুবনমোহিনী দেবী আসলে নবীনচন্দ্রেরই ছদ্মনাম। ‘বিনোদিনী’র প্রথম প্রকাশের তিন মাস পরে ১২৮২ বঙ্গাব্দের (১৮৭৫) এর শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয় থাক্মণি দেবী সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা ‘অনাথিনী’। প্রখ্যাত গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা।[৩] পত্রিকাটি আজিমগঞ্জের ‘বিদ্যাবিনোদ’ যন্ত্রালয়ে ছাপা হলেও প্রকাশিত হ’ত ধুলিয়ান থেকে। ঐ ১৮৭৫ সালেই বহরমপুর থেকে বৃন্দাবনচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নতুন মাসিক ‘সুধাকর’ (প্রথম প্রকাশ কার্ত্তিক, ১২৮২)।

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে জানা যায় যে তখন জেলায় মাত্র দুটো ছাপাখানা ছিল। এর মধ্যে ‘ধনসিন্ধু’ প্রেসে বাংলা, ইংরাজী এবং দেবনাগরী টাইপ ছিল। অন্য প্রেসটির নাম ছিল ‘সত্যরত্ন’ - যেটি শুধুমাত্র বাংলা ভাষাতেই ছাপতে পারত।[৪]

১৮৭৬ সালে (চৈত্র ১২৮২) মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে নতুন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি’। সৈদাবাদের সত্যরত্ন প্রেসে ছাপা এ পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত ‘প্রতিকার’ সাপ্তাহিকটির জন্মও সম্ভবত একই মাসে। প্রথম সাপ্তাহিকটির সম্পাদক ছিলেন হরিমোহন সরকার আর দ্বিতীয়টির সম্পাদক ছিলেন কামাখ্যানাথ গাঙ্গুলী। পত্রিকা টিকে ছিল ১৩২৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ বছর। ১৮৭৭ সালে (ফাল্গুন ১২৮৩) নসীপুর থেকে প্রকাশিত হয় নতুন মাসিক পত্রিকা ‘কুসুম’। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ মৈত্র। এটি ছিল জেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

১৮৭৮ সালে জেলা থেকে নতুন কোন পত্রিকা প্রকাশিত না হলেও ১৮৭৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে তিনটি নতুন পত্রিকা। ১৮৭৯ সালে (বৈশাখ ১২৮৬) বহরমপুর থেকে বের হতে থাকে পাক্ষিক পত্রিকা ‘খেয়াল’ এবং ‘মাসিক সমালোচক’। নন্দলাল রায় সম্পাদিত প্রথম পত্রিকাটিতে কবিতা গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি রম্য রচনাও প্রকাশিত হ’ত। দ্বিতীয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশের তিন বছর পরে (১২৮৯-এ) খেয়াল পত্রিকা মাসিক সমালোচকের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। ১৮৭৯ সালেই বহরমপুর কলেজের কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বের হয় আরেকটি নতুন মাসিক পত্র ‘প্রভাত পঙ্কজ’।

১৮৮৪ সালে (বৈশাখ ১২৯১) বহরমপুর থেকে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্র ‘সৎসঙ্গ’। এই পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগ (সংখ্যা ?) প্রকাশিত হয় প্রথম প্রকাশের ১০ বছর পরে ১৩০১ সানের বৈশাখ মাসে। ১৮৮৫ সালে বহরমপুর থেকে হরিকিশোর রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্র ‘নির্ঝর’ (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১২৯২)। এটিও জেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপত্র ছিল। ১২৯২ বঙ্গাব্দেই কান্দী থেকে প্রকাশিত হয় পূর্ণচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত ‘কান্দী পত্রিকা’। এটি ছিল একটি মাসিক পত্রিকা।

১৮৮৮ সালে সৈদাবাদ থেকে দাস হরিচরণ বন্ধুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা ‘হরিভক্তি তত্ত্ব’ — এটিই জেলা থেকে প্রকাশিত প্রথম ভক্তি শাস্ত্রীয় পত্রিকা। ঐ বছরই বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হয় ‘চন্দ্রহার’ (চন্দ্রহাস ?) নামের একটি সাপ্তাহিক — এই পত্রিকাটির সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১৮৯৩ সালে (১লা বৈশাখ ১৩০০) সৈদাবাদ, খাগড়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘মুর্শিদাবাদ হিতৈষী’। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ সেন। তাঁর পর এই পত্রিকার

সম্পাদনার দায়িত্ব নেন আইনজীবি বনোয়ারীলাল গোস্বামী। মুর্শিদাবাদের একমাত্র পত্রিকা হিসাবে এই পত্রিকাটি শতবর্ষের চৌকাঠ পেরিয়েছে। ভীষণ অনিয়মিত হলেও এটির প্রকাশনা এখনো চলছে। এই পত্রিকাটিই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পত্রিকা যার প্রকাশনা এখনো চলছে।[৫] ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হওয়া আর একটি বাংলা পত্রিকা এখনো জীবিত আছে। সেটি হ'ল হুগলী জেলা থেকে প্রকাশিত হওয়া 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ'। তবে এটির প্রকাশনা শুরু হয় মুর্শিদাবাদ হিতৈষীর মাস তিনেক পর থেকে (প্রথম প্রকাশ ১২ ই আষাঢ়, ১৩০০)।[৬] প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভালো 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষিণী' নামে আরেকটি পত্রিকা সৈদাবাদ থেকে বনোয়ারীলাল মুখোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় ১লা কার্ত্তিক ১২৭৭ থেকে প্রকাশিত হবে বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। তবে এই পত্রিকাটি আদৌ বেরিয়েছিল কিনা তার কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৮৯৪ সালে (ভাদ্র ১৩০১) অযোধ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় সৈদাবাদ থেকে বের হয় জেলার প্রথম হাস্যরস প্রধান পত্রিকা 'নন্দী'। এটি ছিল মাসিক পত্রিকা। ১৮৯৫ সালে (বৈশাখ ১৩০২) বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সৈদাবাদ থেকে বের হয় আরেকটি মাসিক পত্র 'জননী'। ১৮৯৬ সালে (আশ্বিন ১৩০৩) বিপিনবিহারী দাশগুপ্তের সম্পাদনায় সৈদাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় অভিনব মাসিক 'কিউরোপ্যাথিক চিকিৎসা'। পত্রিকা হিসাবে খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও বিষয় বৈচিত্র্যে এ পত্রিকা ছিল ব্যাতিক্রমী প্রয়াস।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জেলা থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের আলোচনায় 'বাঙ্গালীর হৃদয় লুঠ করা' বঙ্গদর্শন- এর কথা বলাও জরুরী। বঙ্কিমচন্দ্র কর্মসূত্রে বহরমপুরে থাকার সময়েই বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা করেন। ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাস থেকে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার কাজ তিনি বহরমপুরে বসেই করেছেন যদিও তা প্রকাশিত হ'ত কলকাতা থেকে। কোন সন্দেহ নেই যে বহরমপুরের সাহিত্যিক পরিমন্ডল ও বহিরাগত বিদ্বৎজন সমাবেশই বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গদর্শন প্রকাশের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকাগুলোর সবগুলো দীর্ঘায়ু না হলেও অনেকগুলিই বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনব ছিল। পত্রিকার মান নিয়ে অনেক প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও বাংলা সাময়িক পত্রের শৈশবাবস্থায় মুর্শিদাবাদের মত প্রত্যন্ত এলাকায় এতগুলো পত্র পত্রিকার সমাবেশ রীতিমতো গৌরবের বিষয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন পত্র পত্রিকা প্রকাশের জোয়ার বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশ কয়েকটা পত্রিকা বিংশ শতাব্দীতেও নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকায় জেলার পত্রপত্রিকার জগতে কখনো শূন্যতা আসেনি। জেলায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পত্রিকা গোবরহাটি থেকে প্রকাশিত রামপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'গৌড়ভূমি'(প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩০৮)। ঐ বছরই মুর্শিদাবাদ শহর থেকে বের হয় কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সুধা' (১৩০৮/১৯০১)। এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন প্রখ্যাত লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।[৭] ১৩১১ বঙ্গাব্দে বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হয় 'উপাসনা'। এ পত্রিকার নেপথ্য নায়ক ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। সম্পাদক ছিলেন যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে 'উপাসনা' সম্পাদনার দায়িত্ব নেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ঐ কাল পর্বেই জেলা থেকে বের হয় হয় 'অভিষেক'(১৩০৯),'চন্দ্রমা' (১৩১৩)। 'কণিকা'(১৩১৪), গোয়েন্দা কাহিনী (আশ্বিন ১৩১৬), বঙ্গীয় গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বঙ্গীয় বৈশ্য সুহৃদ' এবং কাশিমবাজার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্র ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গৌরাঙ্গ সেবক' (ফাল্গুন ১৩১৮)।

১৯২৯ সালে জঙ্গীপুর থেকে দ্বিজপদ সরকারের সম্পাদনায় বের হয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'জঙ্গীপুর বাণী'। ১৩২০ বঙ্গাব্দে বহরমপুর থেকে নিখিলনাথ রায়ের সম্পাদনায় বের হয় 'শাশ্বতী' নামের একটি পত্রিকা। ঐ বছরই সৈদাবাদ থেকে বের হয় অবিনাশ চন্দ্র কাব্যপুরাণ তীর্থ সম্পাদিত শ্রী নিত্যানন্দ সেবক (কার্ত্তিক), ১৯১৪ সালে (৬ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২১বঙ্গাব্দ) জঙ্গীপুর থেকে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সম্পাদনায় বের হয় ডিমাই সাইজের চার পৃষ্ঠার সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র 'জঙ্গীপুর সংবাদ'। তখন এই পত্রিকার নগদ মূল্য ছিল এক পয়সা, বাৎসরিক মূল্য দেড় টাকা। এখনো এই পত্রিকা বের হয়ে চলেছে। বর্তমানে জেলায় প্রকাশিত পত্রিকা সমূহের মধ্যে প্রাচীনত্বে এটির স্থান দ্বিতীয়। 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী'র পরেই স্থান জঙ্গীপুর সংবাদের। ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় জগন্নাথ মজুমদার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'স্টুডেন্টস রিভিউ' (২.১০.১৯১৫)।

১৯২১সালে কান্দীর শকুন্তলা প্রেসের সত্ত্বাধিকারী গোপালচন্দ্র সিংহের উদ্যোগ ও অর্থানুকূল্যে কান্দী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'কান্দী বান্ধব'। (কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট অন নেটিভ নিউজপেপারস্ এ্যান্ড পিরিওডিক্যালস বা অ্যানুয়াল স্টেটমেন্ট অব্ নিউজপেপারস্ এ্যান্ড পিরিওডিক্যালস পাবলিশড্ ইন বেঙ্গল অনুযায়ী গীতা চট্টোপাধ্যায় ১৯২৯ সালে প্রকাশিত পত্রিকার তালিকায় কান্দী বান্ধবের উল্লেখ করেছেন)।[৮] প্রথমে সম্পাদক ছিলেন নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে দেবেন্দ্রনারায়ণ ধর ও সঞ্জয় রায় পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরও পরে পত্রিকার মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। পত্রিকার নতুন সম্পাদক হ'ন সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও চিন্ময় মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাটি এখনও

নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। প্রাচীনত্বে বর্তমানে এটি জেলার তৃতীয় পত্রিকা। ঐ বছরেই বহরমপুর থেকে বের হয় জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত দ্বিমাসিক পত্রিকা 'মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি '।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৬ ই মাঘ শনিবার প্রকাশিত হয় দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পন্ডিত সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বিদূষক। দাদাঠাকুরের ভাষায় অবশ্য তিনি সম্পাদক নন, সেবাইত। ইংরাজী Editor এর পরিবর্তে তাঁর শব্দচয়ন Aid-eater । সম্পাদকের ঘোষণা অনুযায়ী এটি 'ধামাধরা ও উদারপন্থি দলের মুখপত্র'। জেলার পত্র পত্রিকা তো বটেই রাজ্যের পত্র পত্রিকার জগতেও নতুন মাত্রা যোগ করে বিদূষক। আট পৃষ্ঠার ১০˝ X ৭˝ সাইজের এই সাপ্তাহিকটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল সি ১১৫৩। পত্রিকার কভারে ছাপা হয়েছিল পেটমোটা নগ্নগাত্র এক পৈতেধারী ব্রাহ্মণের ছবি। যার কপালে লাল রঙে লেখা 'দুঃখ' বুকে 'দুরাশা' আর পেটে 'উদর রে তুহ মোর বড়ি দুষমন'। বাংলা ব্যঙ্গ পত্রিকার জগতে বিদূষকের অবদান অবিস্মরণীয়।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে জেলা থেকে প্রকাশিত হয় নতুন পত্রিকা- প্রতিধ্বনি। ১৯২৫ সালে বের হয় রেজাউল করীম সম্পাদিত 'সৌরভ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২)। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে বের হয় প্রভাত কুমার চৌধুরী সম্পাদিত 'অ(ণা' (১১.১০.১৯২৬)। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে জিয়াগঞ্জ থেকে বের হয় দেবেন্দ্র নারায়ণ বাগ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা প্রতী(া (১৫.৬.১৯২৭)।

১৯৪০ সালে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) খাগড়া থেকে বের হয় শোভেন্দ্রমোহন সেন সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'মর্ম্মবাণী'। পরের বছরই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'নিরী(া'। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে জেলা থেকে বের হয় দুটি নতুন পত্রিকা অমলেন্দু সরকার সম্পাদিত 'ত(ণ' এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পাদিত 'পূর্ণিমা'। ১৩৫২ সালে খাগড়া থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'প্রান্তিক'।

স্বাধীনতা লাভের পর মুর্শিদাবাদের জেলার প্রথম সংবাদ সাপ্তাহিক 'গণরাজ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালেই। গণরাজের অন্যতম সম্পাদক ও উদ্যোক্ত(া কমল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কিছু ত(ণ কংগ্রেসী একখানি নতুন ধরণের সাপ্তাহিক প্রকাশে উদ্যোগী হলেন ১৯৪৭ সালে। মাথার উপরে মৌলভী রেজাউল করীম আর তাঁর সঙ্গে বিজয় গুপ্ত, শোভেন সেন, কমল বাঁড়ুজ্যে এবং উমানাথ সিংহ। 'গণরাজ' প্রকাশিত হ'ল।' [১০] জেলার কংগ্রেস কর্মীদের মুখপত্র হিসাবে বের হওয়া গণরাজ বছর তিনেকের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়।

পরের বছর জেলা থেকে বের হয় আরো দুটি নতুন পত্রিকা - 'পদাতিক' এবং 'মুর্শিদাবাদ সমাচার'। মুর্শিদাবাদ সমাচার জেলার অন্যতম দীর্ঘজীবী পত্রিকা। বছর চল্লিশেক নিয়মিত ভাবে বেরিয়েছে এই পত্রিকা। বেশ কিছুদিন এই পত্রিকা বেরিয়েছে কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। বিগত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ দিকে এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৯ সালে জেলা থেকে যেসব পত্রিকা বের হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল তীর্থবিজ্ঞান, সংগঠন এবং সুরমঞ্জরী। ১৯৫১ সালে বের হয় তিনটি নতুন পত্রিকা - উন্মেষ, পরিত্র(মা এবং ভারতী। ১৯৫২ সালে বের হয় প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা এবং মুর্শিদাবাদ সংবাদ। ১৯৫৩ আত্মপ্রকাশ ঘটে 'নির্দেশ' ও 'পাঞ্চজন্য' নামে দুটি নতুন পত্রিকার।

১৯৫৪ সালে জেলা থেকে যেসব পত্রিকা বের হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'বাণী', 'ভাগীরথী' এবং 'মুর্শিদাবাদ দর্পণ'। ১৯৫৫ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'উত্তরকাল' ও 'দেহাত' নামে দুটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার। ১৯৫৬ সালে জেলা থেকে বের হয় চারটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা—(িকা, ছাড়পত্র, বর্তিকা ও বীথিকা। এর মধ্যে 'বর্তিকা' পত্রিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহরমপুরের ভ্রাতৃসংঘ থেকে বের হওয়া এই পত্রিকাটি দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন কল্লোলযুগের সুবিখ্যাত কবি মনীশ ঘটক। 'বর্তিকা' এখনও বেরোয়, তবে তার প্রকাশস্থান কলকাতা। সম্পাদিকা স্বনামখ্যাতা মহা(েতা দেবী।

১৯৫৭ সালে জেলা থেকে যেসব পত্রিকা বের হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল কলকাকলি, জনমত, দূত এবং মেঘদূত। কলকাকলি পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন কমল বন্দ্যোপাধায়। 'জনমত' জেলার অন্যতম দীর্ঘজীবী সংবাদ সাপ্তাহিক। প্রথমে এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ। পরে দীর্ঘদিন জনমত বেরিয়েছে রাধারঞ্জন গুপ্তের সম্পাদনায়। ৪০ বছরের বেশী বর্ণময় জীবন কাটিয়ে জনমত-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়েছে ২০০০ সালের ২৪ শে জুন। রীতিমতো ঘোষণা করে যাত্রা শেষ করে জনমত। কাগজ বন্ধ করার কৈফিয়ত হিসাবে সম্পাদক জানিয়েছিলেন অনিবার্যতাই কাগজ বন্ধ করে দেবার একমাত্র কারণ।

১৯৫৮ সালে জেলা থেকে যেসব পত্রিকা বের হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'কালান্তর' এবং 'বোধিদ্রুম'। ১৯৫৯ সালে বের হয় তিনটি নতুন পত্রিকা 'উৎস', 'মূর্চ্ছনা' এবং 'শ্রাবন্তী'। ১৯৬০ সালে আত্মপ্রকাশ করে তিনটি নতুন পত্রিকা 'মুর্শিদাবাদ বার্তা', 'যাত্রী' এবং 'শুভম'। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ বার্তা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র। প্রথমে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য। শ্রী ভট্টাচার্যের পর মুর্শিদাবাদ বার্তা দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয় সুধীন সেনের সম্পাদনায়। এখনো প্রকাশিত হয়ে চলেছে মুর্শিদাবাদ বার্তা।

১৯৬১ সালে দ্বীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘নমামি’। রবীন্দ্রনাথের বহু গান ও কবিতার ইংরাজী অনুবাদ বের হয়েছে এই পত্রিকায়। অনিয়মিত ভাবে হলেও প্রায় ত্রিশ বছর প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকা।

১৯৬৩ সালে জেলা থেকে যেসব পত্রিকা বের হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল চলন্তিকা, পল্লীবার্তা, মিঠেকড়া এবং সংকেত। ১৯৬৪ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটে দুটি পত্রিকার ‘পুনশ্চ’ এবং ‘এষণা’। পুনশ্চ সম্পাদনা করতেন সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত , দীপংকর চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার ও উৎপল কুমার গুপ্ত । ‘পুনশ্চ’ পত্রিকাই পরবর্তী কালে নাম পাল্টে হয় ‘অনীক’। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক। তারপর এটি মাসিক পত্রিকায় পরিবর্তিত হয়। জেলার পত্রপত্রিকার ইতিহাসে এই পত্রিকার নাম অবিস্মরণীয়। দীপংকর চক্রবর্তী ও রতন খাসনবিশ-এর সম্পাদনায় বের হওয়া এ পত্রিকার পাঠক ছড়িয়ে আছে সারা দেশেই।

১৯৬৫ সালে জেলা থেকে বের হয় দুটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা বহুমুখী এবং সংক্রান্তি। ১৯৬৬ তে আত্মপ্রকাশ ঘটে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার। এগুলি হল দুর্গ, মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংকলন, ললিতা, সমাজবার্তা এবং স্বাস্থ্যকথা। ১৯৬৭ সালে বের হয় ‘দীপঙ্কর’ নামে একটি পত্রিকা।

১৯৬৮ সালেও আত্মপ্রকাশ করে পাঁচটি পত্রিকা। এগুলি হ’ল ঝড়, পূবের হাওয়া, প্রবাহ, বাণীকণ্ঠ এবং সাহিত্য সময়। এর মধ্যে ঝড় এবং সাহিত্য সময় পত্রিকা দুটি এখনও বের হয়ে চলেছে। ঝড় পত্রিকা প্রথমে ছিল পাক্ষিক এবং বেরোত রঘুনাথগঞ্জ থেকে। এখন ঝড় সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়েছে। সম্পাদকীয় দপ্তরও উঠে এসেছে বহরমপুরে। এটি জেলার অন্যতম বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র।

১৯৬৯ সালে জেলা থেকে বেরোনো পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘জঙ্গম’ এবং ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’ এবং ‘বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা’ নামের তিনটি পত্রিকা। ‘বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা’ই মফঃস্বল এলাকা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে আত্মপ্রকাশ করে প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘গণকণ্ঠ’। সাপ্তাহিক গণকণ্ঠ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৭৭ সাল থেকে শ্রী চৌধুরীর সম্পাদনায় বের হচ্ছে পাক্ষিক গণকণ্ঠ। মুর্শিদাবাদ জেলা চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে গণকণ্ঠের বিশেষ সংখ্যাগুলি। এই পত্রিকা ঘিরেই উঠে এসেছেন একদল নতুন প্রাবন্ধিক যাঁরা এখন জেলার সুপরিচিত লেখক।

১৯৭১ সালে জেলা থেকে যে পত্রিকাগুলো আত্মপ্রকাশ করে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হ’ল অঙ্কুর, কর্ণসুবর্ণ, বাতায়ন, রেনেসাঁস, (ধো(বেতী, সঙ্কর্ষণ এবং সুচিরা। পীযূষ চন্দ্র সম্পাদিত কর্ণসুবর্ণ বেশ কিছুদিন নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাঝে কিছুদিন বের না হলেও এখন নিয়মিত ভাবে বেরোচ্ছে ‘রেনেসাঁস’।

১৯৭২ সালে বের হওয়া কাগজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল এস্-রেনু, চলোর্মি, চেতনাবার্ত্তা, দ্বান্দিক, বাণী,(এই নামের দুটি পত্রিকা বেরিয়েছিল একই বছরে। একটি বেরিয়েছিল জঙ্গীপুরে এবং অপরটি ছয়ঘরি থেকে), মশাল, মুক্তগঙ্গা এবং স্বর্ণকমল। মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র ‘বিজ্ঞান বিচিত্রা’ও প্রকাশিত হয়েছিল এই সময়েই।

১৯৭৩ সালে জেলা থেকে যে সব পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল ইদানীং, কবিতার জন্য, জলসিড়ি, ফোয়ারা, মুর্শিদাবাদ সন্দেশ, মুর্শিদাবাদের খবর এবং চেতনিক। এদের মধ্যে ইদানীং, জলসিড়ি এবং মুর্শিদাবাদ সন্দেশ এখনও নিয়মিত ভাবে বের হয়ে চলেছে।

জলসিড়ি প্রথমে বেরোত ‘নবীন’ নামে। জেলার সাহিত্য সাময়িকী জগতে জলসিড়ির অবদান আবিস্মরণীয়। এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা দিয়েছে জেলার বেশ কিছু কবি লেখককে। জলসিড়ির সম্পাদক দুলাল ভট্টাচার্য্য হলেও এ পত্রিকার প্রাণপুরুষ অপূর্ব ভট্টাচার্য্য। মুর্শিদাবাদ সন্দেশ প্রথমে বেরোত সত্যরঞ্জন বক্সীর সম্পাদনায়। শ্রী বকসীর অকালমৃত্যুর পর বর্তমানে এ পত্রিকা সম্পাদনা করছেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী গৌরী বকসী। লালবাগ শহর (মুর্শিদাবাদ) থেকে বের হওয়া অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘চেতনিক’ পত্রিকাও আলাদা ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

১৯৭৪ সালে বের হওয়া পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল পূর্বাভাস, বালুচর এবং স্বয়ম্ভর। এর মধ্যে ‘পূর্বাভাস পত্রিকাটি এখনো বের হয়ে চলেছে। ১৯৭৫ সালে যে সব পত্রিকাগুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল কিংশুক, গুলিস্তা, শতদল, সম্রাট এবং হিমানী। ১৯৭৬ সালে বের হওয়া পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কান্দী সমাচার, ফসল, রৌরব, স্মৃতিসত্তা এবং আহদী। রাজ্যের পত্রপত্রিকা জগতে একদা রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল শুভ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘রৌরব’ পত্রিকা। এ পত্রিকা ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী। শেষের দিকে অনিয়মিত হয়ে পড়লেও এ পত্রিকা বেশ কিছু উঁচু মানের বিশেষ সংখ্যা উপহার দিয়েছিল।

১৯৭৭ সালে বের হওয়া পত্রিকাগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ’ল আবহমান শিল্প, গোত্রহীন, ঝরা মুকুল, তমোঘ্ন, পথিক, পূবের ঘন্টা, লিপিকা ইত্যাদি।

১৯৭৮ সালটি জেলার পত্রপত্রিকার জগতে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই বছরই বের হয় জেলার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ‘দৈনিক নতুনবাজার’। এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন শ্রী

সত্যরঞ্জন বক্সী। খাগড়ার স্টাইলো প্রিন্টিং প্রেস (লেটার প্রেস) থেকে ছাপা হ'ত এই দৈনিকটি। পত্রিকার দাম ছিল ১৫ পয়সা এবং মাসিক গ্রাহক চাঁদা ছিল ৪ টাকা। সম্ভবত এই পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল না। ডিক্লারেশন দিয়েই বের হ'ত দৈনিকটি। ডিক্লারেশন নাম্বার ছিল ৪১/১২/৭৮ এন.টি. (এ.এল)। যদিও এটি ছিল দৈনিক পত্রিকা তবু এটি ডাকেও পাঠানো হত। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য যেহেতু দিনের কাগজ দিনেই সর্বত্র পৌছে দেওয়া যেত না সেহেতু পত্রিকায় দুটি তারিখ থাকত। মফঃস্বলের তারিখ থাকত পরের দিনের।[11] এ পত্রিকা দীর্ঘজীবী না হলেও জেলার এযাবৎকালে প্রকাশিত একমাত্র দৈনিক হিসাবে দৈনিক নতুনবাজার যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তা বলাই বাহুল্যমাত্র। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো অধুনা জেলা বইমেলা উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের রেওয়াজ উঠেছে। বিগত তিনটি জেলা বইমেলাতে 'আকাশ' এবং 'বইবাহিত' নামে দুটি দৈনিক পত্রিকা বেরিয়েছিল। এরও আগে ১৯৮৯ সালে মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা উপলক্ষে সান্ধ্য দৈনিক বের করেছিল 'মুর্শিদাবাদ সন্দেশ' পত্রিকা।

১৯৭৮ সালে জেলা থেকে অন্য যেসব পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল উত্তরণ, খিলাড়ী, নবারুণ, পল্লীহাট, বিচিত্রা, অন্যগাঙ ইত্যাদি। খিলাড়ী জেলা থেকে বেরনো খেলাধূলার প্রথম পত্রিকা।

১৯৭৯ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটে এমন পত্রিকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনটি পত্রিকা হ'ল তরঙ্গ, তিয়াস এবং পল্লীতারকা।

১৯৮০ সালে জেলা থেকে বের হওয়া পত্রপত্রিকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল আগ্রহী, কুসুম, গ্রামান্তর, প্রলয়, রাইটার্স গিল্ড, সাগর দর্পণ, হাজার দুয়ারী এবং আবার এসেছি ফিরে। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে রাইটার্স গিল্ড এবং আবার এসেছি ফিরে পত্রিকাদুটি এখনো বের হয়ে চলেছে। রাইটার্স গিল্ড সংবাদপত্র হলেও আবার এসেছি ফিরে সাহিত্য সাময়িকী। এই পত্রিকা বিষয় বৈচিত্রে অভিনব বেশ কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছে।

১৯৮১ সালে জেলা থেকে আত্মপ্রকাশ ঘটে এমন পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল আল ইসলাম, ঋকদৃক, বিদ্রোহী কণ্ঠ, ব্রতাঞ্জলি এবং কোরাস। ১৯৮২ সালেও জেলা থেকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এদের মধ্যে কয়েকটি হ'ল শুভশ্রী, শমীবৃক্ষ, জ্ঞাপয়িতা, নয়া তালাসী, অধিকন্তু, অস্তিত্ব, কান্দী দর্পণ, জঙ্গীপুর বার্তা, নব দিকবলয়, মহীরুহ, মাটির ডাক, রাঢ় দর্পণ, মুর্শিদাবাদ নিউজ, মুর্শিদাবাদ কল্লোল, ইত্যাদি। এদের মধ্যে বার্ষিক পত্রিকা শুভশ্রী এবং সংবাদ পাক্ষিক কান্দী দর্পণ ও রাঢ় দর্পণ এখনো প্রকাশিত হয়ে চলেছে। শুভশ্রী তার বিষয় বৈচিত্রে সারা রাজ্যের নজর কেড়েছে। 'শমীবৃক্ষ'ও তার স্বল্পায়ু জীবনে বেশ কয়েকটি সংগ্রহযোগ্য সংখ্যা পাঠকদের উপহার দিয়েছিল। 'জ্ঞাপয়িতা' নিজেকে বিজ্ঞাপিত করত 'পাক্ষিক জ্ঞান নিবেদক' বলে। এটিও জেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাগজ। ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বর্ষে পত্রিকাটি পুনর্জীবিত হলেও অল্পদিনেই এর প্রকাশ ফের বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮৩ সালে জেলা থেকে বেরনো পত্রপত্রিকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কার্মুক, দেশিক, নীলকণ্ঠ, সঞ্জীবন এবং 'মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা'। দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা' পত্রিকাটি পরবর্তীকালে সাড়া জাগানো পত্রিকা 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ'এর পূর্বসূরী। ১৯৮৪ সালে জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল আয়ূধ, নিউ স্পোর্টসম্যান, পঙ্কশিখা, মহাজীবন, মিতা, রবীন্দ্রবিদ্যা, রাখালিয়া প্রভৃতি।

১৯৮৫ সালে যে সমস্ত পত্র পত্রিকা জেলা থেকে বের হয় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল ঘটনা, পরাগ, বর্তমানের আয়না, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, রাঢ়চর্চা, অমলকান্তি এবং শাব্দিক। এদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, শাব্দিক এবং অমলকান্তি এখনও বের হয়ে চলেছে।

১৯৮৬ সালে জেলা থেকে আত্মপ্রকাশ ঘটে এমন পত্রপত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল জঙ্গীপুরের চিঠি, প্রবাক, ভোর, মৌসুমী, শায়ঙ্ক, জঙ্গী, সংগঠিত সূর্যসেনা, সিনেমা ভাবনা ইত্যাদি। এর মধ্যে জঙ্গীপুরের চিঠি জেলার অন্যতম সেরা সংবাদপত্র যা এখনো নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ঐ বছরই জেলা থেকে প্রকাশিত হয় মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'উদ্ভাবনী'। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের এই পত্রিকাটির নামে পাল্টে হয় 'কি কে ও কেন' আরও পরে নাম পাল্টে হয় 'এবং কি কে ও কেন'। আঠার বছরের বেশী সময় ধরে বিজ্ঞানের এই পত্রিকাটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মফঃস্বল থেকে এত দীর্ঘ সময় ধরে বিজ্ঞানের পত্রিকা প্রকাশের দ্বিতীয় কোন নজির নেই। সংগঠিত সূর্যসেনা মাঝে বন্ধ হয়ে গেলেও ১৯৯৬ সাল থেকে ফের বেরোচ্ছে। এখন এটি দ্বিমাসিক পত্রিকা। সিনেমা ভাবনা জেলা থেকে প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

১৯৮৭ সালে জেলা থেকে বের হওয়া পত্রপত্রিকাগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল জাতক, দক্ষিণী ঢেউ এবং রঙধনু। এর মধ্যে লালগোলা থেকে প্রকাশিত হওয়া রঙধনু এখনও নিয়মিত বের হয়ে চলেছে।

১৯৮৮ সালে জেলা থেকে আত্মপ্রকাশ করে এমন পত্রপত্রিকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল অনন্ত স্রোত, বিশিখা, মুখর, মুর্শিদাবাদ দর্পণ, শতদল, সবুজ ভাবনা, স্বরান্তর, চোখ, ইত্যাদি। সবুজ ভাবনা ছিল মাসিক কৃষি পত্রিকা। এখন এটি হাওড়া জেলা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৮৯ সালে যে পত্রিকাগুলি জেলা থেকে আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল নায়ক, মুর্শিদাবাদ বিচিত্রা, মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ সংবাদ ইত্যাদি। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ সংবাদ এখনো নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বের হয়ে চলেছে।

বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে ও তারপর জেলা থেকে বেশ কিছু নতুন পত্রপত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও তাদের প্রকাশনা অব্যাহত রাখলেও বেশ কিছু পত্রিকা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। উপরে উল্লিখিত পত্রপত্রিকাগুলো ছাড়া জেলা থেকে বিভিন্ন সময়ে যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল অমৃতকুম্ভ, অরণি, অন্বেষা, অর্ঘ্য, অর্কেষ্ট্রা, অন্তিক, অন্য শাব্দিক, অভিযান কুড়ি দিনে, অক্ষরবৃত্ত, অরঙ্গাবাদ বার্তা, আকাশ, আসরডিঙ্গা, আলোলিকা, এই পক্ষের সাম্পান, ঐতিহাসিক চিত্র (সম্পাদক নিখিলনাথ রায়), কান্ডারী, কবিতা রাশি, কন্ঠস্বর, কিংশুক, কিশোর অভিযান, কুশ, কথাশিল্প, কবিতা বারোমাস, কবিতা ২০০০, খোঁজ, গোধূলিবেলা, চৌপর, চারুলতা, চারুবাক, জেহাদ, জোনাকী, জাহানকোষা, জঙ্গীপুর বহ্নিশিখা, জন্মদিন, ত্রিস্তরের অন্তরালে, তরঙ্গ, দলিল বার্তা, নবপ্রভাতী, নরকের তাপ, নারী, নৈবেদ্য, প্রজন্ম, প্রতীক, প্রেক্ষণ, পাহাড়, প্রতিচ্ছবি, প্রদর্শিকা, বাসভূমি, বাবলা, বেলডাঙ্গা খোলামন, বোধোদয়, বরং সাহিত্য, বিবেক, বালার্ক, বহরমপুর সাংস্কৃতিক সংবাদ, বাণিজ্য বার্তা, ভূমিজ, ভীষ্ম, ভালমন্দ, ভাষা, মুর্শিদাবাদ সাহিত্য ও সমাজ, মুক্তগঙ্গা, শিল্পনগরী, শরতের ফুল, শিলোঞ্ছ, সাগরিকা, সাগর দর্পণ ইত্যাদি।

জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর সবগুলোই যে গুণমানে খুব উৎকৃষ্ট তা বলা যায় না। কোন কোন পত্রিকা তার স্বল্পায়ু জীবনেও এমন কিছু সৃষ্টিশীল কাজ করেছে যে তা আলাদা ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। আবার দীর্ঘায়ু জীবনেও তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করে উঠতে পারেনি এমন পত্রিকারও অভাব নেই। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জেলার পত্রপত্রিকাগুলো যে জেলার জনজীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা

বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে ধারা স্বকীয়ভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে মুর্শিদাবাদের অবদান অনন্য। মধ্যযুগের মুর্শিদাবাদ দরবারী সঙ্গীতের পীঠস্থানরূপে পরিচিতি পেলেও প্রাচীন যুগ হতেই এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তার নানান পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজা শশাঙ্কের যুগে যে দরবারী পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তা পাল ও সেন যুগে আরও বিস্তৃত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের গোলাহাটে প্রতিষ্ঠিত 'জয়মঙ্গলা' (পাল-সেন যুগের সরস্বতী) ও জিয়াগঞ্জের সংগ্রহশালায় রক্ষিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা' তার পরিচয় বহন করছে।

তুর্ক - আফগান যুগে শ্রী চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের প্রচারে ভক্তিসঙ্গীতে বাংলার আকাশ-বাতাস মেতে উঠেছিল, তার জোয়ার মুর্শিদাবাদকেও প্লাবিত করেছিল। পঞ্চদশ শতকের কৃষ্ণদাস কবিরাজ (ঝামটপুর), যদুনন্দন দাস ঠাকুর (মালিহাটী), 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' - কার নরহরি সরকার (শ্রীখণ্ড) (১৪৭৫ - ১৫৪০), যোড়শ শতকের ঠাকুর নরোত্তম দাস (১৫৩১ - ৮৭), গদাধর পণ্ডিত (স্বরূপ দামোদর, ভরতপুর), গোবিন্দ চক্রবর্তী (বোরাকুলি), তেলিয়া বুধুরীর বলরাম দাস, 'স্মরণদর্পণ' ও 'সাধনচন্দ্রিকা'- কার রামচন্দ্র কবিরাজ, 'গীতামৃত' রচয়িতা গোবিন্দ দাসের রাগাশ্রয়ী গান, 'আখড়াই' গান এবং নিধুবাবুর (রামনিধি গুপ্ত) শিষ্য মোহনচাঁদ বসুর 'হাফ্ - আখড়াই গানের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মহারাজ নন্দকুমারের গুরু মালিহাটীর রাধামোহন ঠাকুর (জন্ম ১৬৬৮) রচিত পেদামৃত সমুদ্র' ও সপ্তদশ শতকের শেষ দশকের নরহরি চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম দাস রচিত 'ভক্তিরত্নাকর', 'সঙ্গীতসার', 'গীত চন্দ্রোদয়', প্রভৃতি গ্রন্থাদি এ জেলার সঙ্গীত ঐতিহ্যের বুনিয়াদকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের যে কয়েকটি অঞ্চলে ১৭৫০ - ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রাগসঙ্গীত চর্চার সূচনা হয়েছিল, তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ দরবার অন্যতম। সুজাউদ্দিনের (১৭২৭ - ৩৯) সময় ফর্হাবাগ এবং সিরাজ-উদ্-দৌল্লার সময় হীরাঝিল ছিল সঙ্গীত-সাধন-ক্ষেত্র। সিরাজ-উদ্-দৌল্লা সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদে যে রাগমালা প্রতিকৃতি চিত্রকলা অঙ্কিত হয়েছিল তার মধ্যে 'হিন্দোল' (১৭৫৫) ও 'কুকুভ' মিসেস ডি.আর্সি হার্চের সংগ্রহশালা এবং শিবপূজারত 'ভৈরবী'র চিত্রাবলী বোলডীন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক দরবারে বিভিন্ন সময় বহিরাগত যে সকল কিন্নরকণ্ঠী নটীরা এসেছেন, তাঁরা অনেকেই স্থায়ীভাবে থেকে যান। সিরাজ-উদ্-দৌল্লা ও এক্রাম-উদ্-দৌল্লার বিয়েতে দিল্লী থেকে বিশুদ্ধা বাঈ, মুন্নি বাঈ ও বাব্বু বাঈকে আনা হয়। এই মুন্নিবাঈ ও বাব্বু বাঈকে মীরজাফর বেগম করেন। এছাড়া সে সময়ের উল্লেখযোগ্য নটীদের মধ্যে ফৈজী বাঈ, ভগবাঈ, মৈনী বিবি, আনন্দী বাঈ, ধূমন বাঈ, গোরামণি বাঈ, নিকী বাঈ অন্যতম। নিকী বাঈ ছিলেন মুর্শিদাবাদের আদি বাসিন্দা সেহদী বিবির দৌহিত্রী। 'বাঙালী চরিতাভিধান' - এ পাই তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে ১৮২৩ সালে নর্তকী নিকী রাজা রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগান বাড়িতে নাচেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভারতীয় সঙ্গীত ধারায় নৃত্যসহ দাঁড়িয়ে গাওয়া যে 'খাড়ি ঠুংরী' ধারার প্রচলন হয়েছে, তার উৎসভূমি এই মুর্শিদাবাদ।

ধ্রুপদ - ধামারের ধারা ধরেছিলেন বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা, হীরা বুলবুল, আলি হোসেন, মীরবান্দা হোসেন, মুর্শিয়া খাঁ, লক্ষ্মণ মুখোপাধ্যায়, কুটিল কার্ত্তিক প্রভৃতি কলাবিদগণ। সুররসিক ফেরাদুন জা (১৮৩৮-৮৪) গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮০৮ - ৭৪) সঙ্গীতে কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'ধ্রুপদ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ যদুভট্ট (১৮৪০ - ৮৩) ও হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩০ - ৯৮) তাঁর দুই কৃতি শিষ্য।

তৎকালীন যে সকল কলাবিদ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মীরকাশিমের পুত্র বাহার খাঁ (বীণা) ও কন্যা গুল (বীণা), পুতলী বিবি (বীণা), বরোদা হতে আগত মৌলাবক্স খাঁ (বীণা, জলতরঙ্গ) সরফুদ্দিন খাঁ (দিলরুবা), আসীর নজর আলি খাঁ (বাঁশী), আলি হোসেন (সরোদ), মুরশেদ আলি খাঁ (বীণা), ওয়াজেদ আলি খাঁ (বীণা), আশাক আলি খাঁ (কানুন) ও চৈতন্যদাস স্বামীর পুত্র রতনচাঁদ স্বামী (১৮০২ - ৬৩) (বীণা, রবাব, সুরবাহার, সেতার) অন্যতম।

মুর্শিদাবাদের সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে আতা হোসেন খাঁ (১৮১৮-১৯০৯) অনন্য। তাঁর পিতামহ মিঞা মল্লু খাঁ (মৃদঙ্গ, তবলা) দিল্লী ও লক্ষ্ণৌবাজের মিশ্রণে ' ঠেকা ছপকা', দুনিলয়ের গৎ' , 'আড়ির গৎ' সৃষ্টি করেন এবং তাঁর পিতা হোসেন বক্সও (পাখোয়াজ) ছিলেন খ্যাতিমান বাদক। আতা হোসেন সৃষ্ট ' মোহড়া', 'ফারাখ', 'সোল', 'দম(ম পরণ', 'গজগমন পরণ','তেহাই সহপাল্লা', 'আড়িলয়ের টুকরা', 'ছপকার গৎ' অনবদ্য। তিনি ১৮৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডে রাণী ভিক্টোরিয়ার আসরে অতি দ্রুত লয়ে তবলা বাদনে শ্রোতামণ্ডলীকে চমকিত করেন। তাঁর কাছে তবলার শিক্ষা পান প্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সাহা বণিক (১৮৫৭ - ১৯৩৬), সারদাপ্রসাদ রায়, অবনীনাথ গাঙ্গুলী, লালগোলার যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় (১৮৫৩ - ১৯৪৬), গোপেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর (মৃত্যু ১৯২১), উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র বসু, কাদের বক্স (১৮৭৭ - ১৯৬৮) মণি ধাড়া, রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎ কিশোর গোস্বামী (জিয়াগঞ্জ), ভবানীচরণ বসু প্রমুখ শিল্পীগণ।

মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন ধারায় কীর্তনচর্চা মধ্যযুগ থেকেই শুরু। যে সকল স্বনামধন্য কীর্তনীয়া ও পদকর্তা ভক্তিরসের প্লাবন আনেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের (জন্ম - ১৫১৯) শিষ্য সুকণ্ঠ গায়ক রামচন্দ্র কবিরাজ (ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে) লীলাকীর্তনের সংগঠক, 'গৌড়চন্দ্রিকা'র প্রবর্তক নরোত্তম ঠাকুরের (১৫৩১ - ৮৭) শিষ্য 'গড়ানহাটী' ধারার গায়ক গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর। জিয়াগঞ্জের গাম্ভীলা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মণিপুরী নৃত্যের উদ্ভাবক ও রূপকার মণিপুর - রাজ ভাগ্যচন্দ্র ছিলেন গঙ্গানারায়ণের প্রিয় শিষ্য। কান্দী ভরতপুরের গদাধর গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ), 'অশ্বমেধ' পর্বের রচয়িতা দ্বিজ হরিদাস (ষোড়শ শতক, ভরতপুর, কাঞ্চনগড়িয়া), সৈদাবাদের 'সারার্থদর্শিনী' প্রণেতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিশিষ্ট পদকর্তা ও 'রাণীহাটি' (রেনেটি) রীতির গায়ক উদ্ধব দাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার, অষ্টাদশ শতক), 'ঢপ কীর্তনে'র প্রবর্তক বেলডাঙ্গার রূপচাঁদ অধিকারী 'রেনেটি' রীতির শাস্ত্রজ্ঞ গায়ক 'পদকল্পতরু' সংকলক গোকুলানন্দ সেন (বৈষ্ণব দাস, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে), পাঁচথুপির কৃষ্ণহরি হাজরার (মনোহর শাহী) শিষ্য কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র (চান্দোজী, ১৭৯৪ - ১৮৮১), 'মনোহর শাহী' ধারার গায়ক ও মৃদঙ্গী রসিকলাল দাস (দক্ষিণখণ্ড, ১৮৪১- ১৯১৩) মাণিক্যহারের শচীনন্দন দাস (১৮৫৬ - ১৯২৬), বনমালী দাসের শিষ্য সুকণ্ঠ গায়ক গণেশ দাস (১৮৬০ - ১৯৩৭), হাসানপুরের ফটিক চৌধুরী (১৮৭০-১৯৩৭) শচীনন্দন - শিষ্য খ্যাতিমান খোলবাদক ও কীর্তনীয়া রাধাকৃষ্ণ দাস, অনুরাগী দাস, সুগায়ক রাধেশ্যাম দাস, পদকর্তা সৈয়দ মর্তুজা (রঘুনাথগঞ্জ), পদকর্তা নাসির মামুদ (ছাপঘাটি), কান্দীর দামোদর কুণ্ডুর শিষ্য অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় (বরা, ১৮৬৪ - ১৯৪৪), 'কীর্তন বারিধি' দুঃখভঞ্জন সান্যাল (প্রভঞ্জন, ১৯০৬ - ৮৩), যামিনী মুখোপাধ্যায় (দক্ষিণাখণ্ড), অবধূত শিষ্য নন্দকিশোর দাস (দোপুকুরিয়া), হরিসাধন দাস ও মঞ্জু সাহেবের শিষ্যা জিয়াগঞ্জের 'কীর্তন সাম্রাজ্ঞী' রাধারাণী (১৯১৩ - ৯৭), পঞ্চানন দাস (শক্তিপুর), নিত্যানন্দ গোস্বামী (বহরমপুর, ১৯০৫ - ৭৮), গোপাল দাস (বহরমপুর) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুবিখ্যাত টপ্পা গায়ক শ্রীধর ভট্টাচার্য্য (জন্ম ১৮১৬)যিনি শ্রীধর কথক নামে অধিক পরিচিত, তিনি বহরমপুর কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের কাছে কথকতা শেখেন। তিনি বাংলা, হিন্দী, আরবী ও ফার্সী ভাষায় বহু টপ্পা রচনা করেন। বহরমপুরের অধিবাসী রাধামোহন সেন (জন্ম ১৮১৮, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ) সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে 'সঙ্গীত তরঙ্গ' রচনা করে খ্যাতিমান হন। বহরমপুরের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ ও সঙ্গীতকার ডঃ রামদাস সেন (১৮৪৫ - ৮৭) প্রসঙ্গে 'সঙ্গীত কোষ' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা) এ রয়েছে — 'তত্ত্ব সঙ্গীত লহরী তাঁর সঙ্গীত সংকলন। তাঁর রচিত গানের মধ্যে ভক্তিগীতিই প্রধান। ধ্রুপদ ও টপ্পা উভয় অঙ্গেই তিনি গান রচনা করেন।'

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভকাল থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। কাশিমবাজার, জাফরাগঞ্জ, নসীপুর, কান্দী, জেমো, জজান, নিমতিতা, কাঞ্চনতলা, সোনারুন্দী, বনওয়ারীবাদ, রসোড়া, প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন ধনাঢ্য ও সঙ্গীতরসিকদের বাড়ীতে নানান উৎসব উপলক্ষে মেহফিল বসানোর রেওয়াজ ছিল। তাই বহরমপুর ও আশে-পাশের অঞ্চলে অনেকগুলি 'খেমটা'র দলও গড়ে উঠতে থাকে। সাংবাদিক কমল বন্দোপাধ্যায় (১৯১৩ - ৮৪) এর মতে 'লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজীদের মতো মুর্শিদাবাদের খেমটাওয়ালীদেরও এককালে বাংলার সর্বত্র

নামডাক ছিল এবং তাদের নাচগান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।' এছাড়া বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদে 'ব্রহ্মমন্দির' ও 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি' ছিল, সেখানে উপাসনার অঙ্গ ছিল ব্রহ্মসঙ্গীত। বাংলা গান সম্পূর্ণ ধ্রুপদী রীতিতে রাগ - রাগিনীর আধারে ব্রহ্মসঙ্গীতরূপে গীত হ'ত। এর ফলেও এ জেলার সঙ্গীতচর্চা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। কাশিমবাজারের রাজসভায় ভারতবিখ্যাত গুণীজনদের প্রায়ই নিয়ে আসতেন। ১৯০৫ সালে এ অঞ্চলে প্রথম সঙ্গীত শিক্ষায়তন 'বহরমপুর সঙ্গীত সমাজ বিদ্যালয়' স্থাপন করে সেখানে অধ্যক্ষরূপে বিষ্ণুপুর ঘরানার মহাগুণী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে (১৮৬৩ - ১৯২৫) আনেন। এ ছাড়াও বিশ্বনাথ রাও ধামারী (মৃত্যু ১৯২১) শিক্ষকরূপে যোগ দেন। এখানে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কিশোরী মোহন ভাস্কর (মৃত্যু - ১৯২৫), হরিপদ মুদী (মৃত্যু - ১৯৫৩), কালিপদ রায়, কালিকাচরণ রায়চৌধুরী (১৮৯২ - ১৯৭৫), ধীরাজ রায় (ধ্রুপদী), কমলাক্ষ দাশগুপ্ত (ধ্রুপদ), ধর্মদাস ঘোষ (১৮৯০ - ১৯৪৫), জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী (১৯০২ - ৪৫) প্রভৃতি বহু শিল্পী শিক্ষার সুযোগ পান।

সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (১৮৪৮ - ১৯৪৮) মুর্শিদাবাদের সঙ্গীতধারার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রথম গুরুরূপে রাধিকাপ্রসাদকে পেলেও পরবর্তী কালে পান গণপত রাও ভাইয়া সাহেব (১৮৫৫ - ১৯২০), মৈজুদ্দিন খাঁ (১৮৮৪ - ১৯২৯), মুজফ্ফর খাঁ (১৮৫৮ - ১৯৫০), নবাব সাদত আলি খাঁ (ছম্মন সাহেব), মেহেদী হোসেন খাঁ (জন্ম ১৮৮৩) ও খলিফা বদল খাঁ (১৮৩৪ - ১৯৩৭) প্রমুখ দিকপাল ওস্তাদদের। তিনি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী, দাদ্‌রা, ভজন প্রভৃতি গানের সুবিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর 'মেগাফোন' রেকর্ডে 'ভৈরবী', 'মেগাফোন' রেকর্ডে 'তাড়ানা', 'শরণ মে আয়ি' (ভজন), 'এরী মাই আজ', 'মোরে কৃষ্ণমুরারী' (পিলু) সকলকে মুগ্ধ করে। 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'-র সম্পাদক, 'সঙ্গীত সম্মিলনী'-র অধ্যক্ষ, 'সঙ্গীত ভারতী' ও 'সঙ্গীত কলা ভবনের' প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ এবং 'নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন'এর ভগীরথ রূপে গিরিজাশঙ্কর প্রকৃতই সঙ্গীতাচার্য।

গিরিজাশঙ্করের অগণিত শিষ্য - শিষ্যাদের মধ্যে ডঃ যামিনী গাঙ্গুলী (জন্ম ১৯০৭-২০০২), জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (১৯১০-৯৮), তারাপদ চক্রবর্তী (১৯০৮-৭৫), সুখেন্দু গোস্বামী (১৯১১-৮৩), সুধীরলাল চক্রবর্তী (১৯১৬ - ৪৯), সুনীলকুমার বসু (মৃত্যু - ১৯৮৩), রথীন চট্টোপাধ্যায় (১৯০-৮৩), উমা দে (মিত্র) ,এ.কানন, নুটু মুখোপাধ্যায় (১৯১০-৯৯) ,নয়না দেবী (১৯২০-৯৩), জয়কৃষ্ণ সান্যাল (১৯১১-৮৮), বীরেশ রায়, রাধাকান্ত সরকার (বহরমপুর) বেচু দত্ত (১৯১৮-৯১), রাধাবিনোদ ঠাকুর (হাবল), শ্যামাপদ গাঙ্গুলী (১৯০৭-৭৩), জগন্নাথ দাস (মাস্টার মন্টু) (১৯০৬-৮৬), ব্রজগোপাল সেন (এসরাজ) , বেলারাণী সেন, অনিল কুমার রায় (বাবলি), গীতা দাস (মিত্র), সাধনা বোস (১৯১৪ - ৭৩), চিন্ময় লাহিড়ী (১৯১৬ - ৮৪), শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শেখ মুন্নার পুত্র লালবাগের কাদের বক্‌স (১৮৮৭ - ১৯৬৮) আতা হোসেনের কাছে তবলা শিক্ষার পর গানের তালিম পান রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ঠাকুর নবাব আলি খাঁ ও মেহেন্দী হোসেনের কাছে। তাঁর রচিত 'সঙ্গীত প্রকাশ' 'সঙ্গীত বিকাশ', 'সঙ্গীত কানন' 'সঙ্গীত বিতান' অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত গ্রন্থ। তাঁর শিষ্য - শিষ্যাদের মধ্যে মঞ্জু সাহেব (১৮৯৪ - ১৯৪৬), গোঁদাল বক্‌স (পুত্র), ফজলে হক (পুত্র), দুলাল মান্না, অরুণ কুমার দত্ত, শচীনদেব বর্মণ (১৯০৬-১৯৭৫), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ - ১৯৭৬), কুমারকৃষ্ণ ঘোষ (১৯১০ - ৬৩), শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবানী শীল (জিয়াগঞ্জ), নবাব জানী মীর্জা, ঊষারাণী সান্যাল (১৯২২ -৯৪), বাসুদেব ভট্টাচার্য্য, 'কলাবিতান'-এর প্রতিষ্ঠাতা শৈলেশকুমার রাহা, কমল দত্ত, 'স্বরলিপি' প্রণেতা পীযূষ রায় (জন্ম - ১৯৪১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের বাকার আলি মীর্জা ও বিজ্ঞান বাঈ - এর পুত্র সুকণ্ঠ গায়ক সৈয়দ আনোয়ার আলি মীর্জা (মঞ্জু সাহেব) (১৮৯৪-১৯৪৬) খেয়াল, ঠুংরী, গীত, গজল, ভজনের অসামান্য শিল্পী। তাঁর শিষ্য - শিষ্যাদের মধ্যে রাধারাণী (কীর্তন, ১৯১৩ -১৯৯৭), সৈয়দ আলি মীর্জা (জন্ম-১৯১৪) সন্তোষ সেনগুপ্ত, জগন্নাথ দাস (মাষ্টার মন্টু) (১৯০৬ -৮৬), দুঃখভঞ্জন সান্যাল (কীর্তন, ১৯০৬-৮৩) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ধ্রুপদ বাহাদুর' গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮০১ - ৭৪) শিষ্য মহামহোপাধ্যায় মৃদঙ্গাচার্য শ্রীরাম শিরোমণি (১৮২৩ - ১৯০৪) 'তেরধা তেহাই'-এর আবিষ্কর্তা, 'থাপ', ও 'টকী' বাদ্যের প্রবাদ প্রতিম শিল্পী। তাঁর পুত্রদ্বয় পাখোয়াজী প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য ও কুলদাচরণ ভট্টাচার্য্য (মৃত্যু ১৯২৮) ছিলেন দক্ষ বাদক। কাজী নজরুলের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও তাঁর 'গানের ভগীরথ' উমাপদ ভট্টাচার্য্য (ফেনু ১৮৯৬ - ১৯৩৮) সে সময় রেকর্ড শিল্পীরূপেও বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরকার অনিল বিশ্বাস, অনিল বাগচী (১৯০৭-৭৭), অনুপম ঘটক, রমাপদ ভট্টাচার্য্য, নিতাই ঘটক, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কমলা মিশ্র (কন্যা)প্রমুখ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদে যাঁরা সুরচর্চায় মগ্ন ছিলেন তাদের মধ্যে কৃষ্ণনাথ চৌধুরী (ধ্রুপদ), আনন্দচন্দ্র ঘোষ (ধ্রুপদ), ছেদুলাল রায় (ধ্রুপদ), বরদা চক্রবর্তী (ধ্রুপদ), বসন্ত মুখোপাধ্যায় (পাখোয়াজ), জিতেন সিং (সুরবাহার), সখাওত

হোসেনের (১৮৮০ - ১৯৫৫) শিষ্য ব্রজনাথ ঠাকুর (সেতার), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সেতার), যদুনাথ বাগচী (সেতার), আজম আলি (সেতার), হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (তবলা, পাখোয়াজ), লালবাগের ইউসুফ সাহেব (হারমোনিয়াম), উমীচাঁদ কুঠারী (আজিমগঞ্জ), 'ব্যাণ্ডমাষ্টার' নেপোলিয়ান (বেহালা), 'মাষ্টার' হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (বেহালা), রমানাথ সরকার (ক্লারিওনেট), ডাঃ বরদাশঙ্কর ঠাকুর (তবলা) (১৮৯৩ - ১৯৫৯), 'গীতসূত্রসার পরিশিষ্ট' (১৯৩৪) প্রণেতা হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (বেহালা), ফণিভূষণ মণ্ডল (তবলা), হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (মেঘু, তবলা) শশধর ঠাকুর (সেতার), চাঁদপুর পাটিকাবাড়ীর জয়পতি দত্ত (তবলা, পাখোয়াজ), আমতলার কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কণ্ঠ ও তবলা) (১৮৭৭ - ১৯৩৩), বহরমপুরের লালমোহন ভট্টাচার্য্য (এসরাজ, সেতার), সূর্যকান্ত ত্রিবেদী (সেতার), যতীন্দ্র হাজরা (হারমোনিয়াম), রামকৃষ(চক্র(বর্তী উল্লেখযোগ্য।

কাশিমবাজারের রায়বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ ও আশুতোষ রায়ের রাজসভাতে বহু সঙ্গীত শিল্পী আসতেন। দ্বারভাঙ্গার সুরকার ও সেতারক্বাদক রামগোবিন্দ ও রামে(্বর পাঠক আসেন। রামে(্বরের কাছে শি(ার সুযোগ পান কমলারঞ্জন (সেতার), দুর্গাপদ দাস (সেতার), দেবিকা দেবী (সেতার), দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (খেয়াল, ঠুংরী), বলরাম পাঠক (সেতার), বিজন ঘোষ (সেতার), অভয় সান্যাল প্রমুখ শিল্পীগণ।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক হতে যাঁরা এ জেলার সঙ্গীতচর্চার ধারাকে অগ্রগতি দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় রামকৃষ(লাহিড়ী (এসরাজ), কমল সিং, জয়রাম লাহিড়ী (এসরাজ) মেঘু ভট্টাচার্যের শিষ্য নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (পাখোয়াজ, তবলা), রাজকুমার (এসরাজ), বগলা দাস, ভ ঞ্জন সিং (বেহালা), সৈদাবাদের ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় (এসরাজ, মৃত্যু ১৯৬০), লালমোহন ভট্টাচার্য্য (এসরাজ), ও খলিফা বদল খাঁর (সারেঙ্গী) (১৮৩৪ -১৯৩৭), শিষ্য ব্রজগোপাল সেন (এসরাজ, সারেঙ্গী) , ধনপতি সান্যাল (বেহালা, ১৯০৫ -৭০), বরদা শঙ্কর ঠাকুরের শিষ্য ভবানন্দ গোস্বামী (তবলা, ১৯০৭ -৭৩), নাসি(দ্দিন ডাগর ঘরানার রমেশচন্দ্র চত্র(বর্তীর শিষ্য জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কা(শিল্পী গৌরচন্দ্র ভাস্কর (ধ্রুপদ, ১৯০৯ - ৯৪), অমিয় কান্তি ভট্টাচার্য্যের (১৯১৬ - ৬৯) শিষ্য গোপাল মজুমদার (সেতার, এসরাজ), গোরাবাজারের ফুল মহম্মদ ও হায়দার আলি, ভূধর চট্টোপাধ্যায় (বেহালা) বরদা ও মেঘু ভট্টাচার্যের ছাত্র ষোড়শী বন্দোপাধ্যায় (তবলা), হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (১৯১০-৯৩) শিষ্য শচীন সেন (তবলা), কান্দী জজানের কুমারকৃষ(ঘোষ (তবলা, ভজন, ঠুংরী) (১৯১০-৬৩), গিরিধারীলাল (এসরাজ), শুভ্রাংশু শেখর মৈত্র (খেয়াল), প্রখ্যাত শিল্পী ও শি(ক প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত (বহরমপুর), শ্যামলকুমার সেনগুপ্ত (জন্ম - ১৯২৪), আলাউদ্দিন খাঁর (১৮৬২ - ১৯৭২) শিষ্য দ্যুতিকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (সেতার) (কালিতলা দিয়ার), কান্দীর 'সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভাকর' প্রণেতা বিভূতিভূষণ আচার্য্য (১৯২৯-৯৩) প্রমুখের।

'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রবেশিকা' প্রণেতা বহরমপুরের ডঃ যামিনী গাঙ্গুলী (জন্ম ১৯০৭) একালের অন্যতম সঙ্গীতাচার্য। তিনি গিরিজাশঙ্কর চত্র(বর্তী, দবীর খাঁ, মেহেদী হোসেনের কাছে সঙ্গীত শি(া করেন।

খেয়াল ঠুংরী ভজনের অপ্রতিদ্বন্দী শিল্পী রাধাবিনোদ ঠাকুর (হাবল) (১৯০৮ - ৫৮) পিতা গোপেন্দ্র নারায়ণের কাছে তালিমের পর জিয়াগঞ্জের জগৎকিশোর গোস্বামী (তবলা), রাধাকান্ত সরকার ও গিরিজাশঙ্করের শিষ্যত্ব নেন। তাঁর শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে শচীন্দ্রনাথ চাকী (ফিরোজপুর), অনিলকুমার রায় (বাবলি), অন্ধ গায়ক বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম (১৯২৫), আবু দাউদ (১৯২৫ -৯৯), দেবদাস ভট্টাচার্য্য (তবলা), অনিমা ঠাকুর, অপর্ণা ভট্টাচার্য্য, শৈলেশকুমার রাহা, কান্দীর নারায়ণচন্দ্র শী (জন্ম - ১৯৩৯) অন্যতম।

ডাঃ বরদাশঙ্করের (১৮৯৩ - ১৯৫৯) পুত্র ও শিষ্য প্রবাদ প্রতিম ভবানীশঙ্কর ঠাকুর (সনাতন) (১৯২০ -৬৭) তবলা ও হারমোনিয়ামের এক বিস্ময়কর শিল্পী। সে সময় তাঁর বাসভবন ছিল সঙ্গীতের পীঠস্থান। ভবানীশঙ্করের ভগ্নী দয়াময়ী ভট্টাচার্য্য (১৯৩২-৯৫) ঠুংরী ভজনের অনবদ্য শিল্পী হলেও তৎকালীন একমাত্র মহিলা তবলাবাদিকা রূপেও অনন্যা।

রাধাবিনোদ ঠাকুর ও এ কাননের শিষ্য ওস্তাদ আবু দাউদ (১৯২৫ -৯৯) এ জেলার মার্গসঙ্গীত চর্চার (ে ত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে পণ্ডিত অ(ণ ভাদুড়ীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৯ - ৪৭ সালে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে তাতে কলকাতা, ঢাকা, রাজশাহী ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিল্পী বহরমপুরে এসে সমবেত হন ও স্থায়ী থেকে যান। এতে এ জেলার সঙ্গীত চর্চায় আরো জোয়ার আসে।

ওস্তাদ ওয়ালিউদ্দিন (মৃত্যু - ১৯৫৫) ও ধীরেন্দ্রনাথ বসুর (১৮৮২ - ১৯৫৩) শিষ্য কলকাতার পুলিন পাল (১৯১৭ - ৯৩) অতি উচ্চাঙ্গের সেতার শিল্পী। ১৯৩৮ এর মার্চ মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ীতে তাঁর সুমধুর বাজনা শুনে মহাত্মা গান্ধীও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি 'রঞ্জনাবতী' ও 'সিন্ধুরঞ্জনী' রাগ সৃষ্টি করেন।

সঙ্গীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮৮ - ১৯৪৮) শিষ্য 'নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে' (১৯৪০ - ৪১) , 'ক(ণাময়ী চ্যালেঞ্জ শীল্ড' বিজেতা সুধীরেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী (১৯১৩-৯৯) খেয়াল-ঠুংরীর

সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও শিক্ষক।

এ জেলায় সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে বহিরাগত আরও অনেকে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীনিবাস নাগ (বেহালা, সুরবাহার), অতুল চৌধুরী (ধ্রুপদ) বিমল চৌধুরী (পাখোয়াজ), প্রসন্ন বণিক (১৮৫৭ - ১৯৩৬) হরিপদ সান্যাল (তবলা), সমর ভট্টাচার্য্য (নৃত্য), চিত্ত দাশগুপ্ত (নৃত্য), বিভিন্ন গান - বাজনায় পারদর্শী ও সঙ্গীত রচয়িতা বিজয় ঘোষ (পণ্ডিত বেনীপ্রসাদ), অপরেশ লাহিড়ী, অমরেশ লাহিড়ী অন্যতম।

বর্তমানে এ জেলায় তবলার প্রচারে ভাবানীশঙ্কর ঠাকুর (১৯২০-৬৭) ও সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের (১৯১০-৯৮) শিষ্য নিত্যগোপাল সাহা (তবলা) এখনও সক্রিয়।

ভারত বিখ্যাত শিল্পী অরুণ ভাদুড়ী (জন্ম -১৯৩৬) আবু দাউদ (১৯২৫ - ৯৮), ইস্তিয়াক হোসেন খাঁ (১৯০৮ - ৮০)প্রমুখের কাছে শিক্ষান্তে স্বকীয় ধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

যে সকল সঙ্গীত সংস্থা মুর্শিদাবাদ জেলায় নানান সময় ভারত বিখ্যাত মহাগুণীদের এনে সঙ্গীতাসর করে অগণিত শ্রোতৃমণ্ডলী গড়ে তুলেছেন, তাদের অবদানও কম নয়(এ প্রসঙ্গে 'মজলিস' (১৯৫০), 'সমাগম' (১৯৬০), 'বৈকুণ্ঠ মেমোরিয়াল ক্লাব', 'শশিভূষণ ক্লাব', 'গিরিজাশঙ্কর সঙ্গীত সংস্থা', 'ছন্দশ্রী' (১৯৭৩), 'মানসী' (১৯৭৬), 'রাগরাগিনী' (১৯৭৬), 'সঞ্চারী' (১৯৭৭), 'ছায়ানট' (১৯৭৭), 'মুর্শিদাবাদ সন্দেশ' (১৯৭৫), 'রাগম' (১৯৭৯), 'গিরিজাশঙ্কর স্মৃতি সংসদ' (১৯৭৯), 'মিউজিক লাভার্স' (১৯৮০), 'সরগম' (১৯৮৩), 'নূপুর' (১৯৮৪), 'বহরমপুর সঙ্গীত সম্মিলনী' (১৯৮৩), 'সুরসপ্তক' (আজিমগঞ্জ), রাগেশ্রী' (১৯৮৩), 'গীতশ্রী' (১৯৮৩), 'স্বর্ণময়ী ক্লাব', 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' (১৯৮৪) প্রভৃতি সংস্থার নাম উল্লেখযোগ্য।

গণ সংগীত

গণসঙ্গীত নামে সঙ্গীতের আর একটি ধারা এজেলাতেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সমাজ যখন ধনতন্ত্রের পথে এসে দাঁড়ায় তখন শ্রমজীবি মানুষ যে শ্রেণী - সংগ্রামের পথে শোষণের যন্ত্রণার ফয়সালা করতে চায়, তখন সেই সংগ্রামের আবেগে গানও সৃষ্টি হয়। এই দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সৃষ্টি করেছিল দেশপ্রেমের গান, স্বদেশী গান, জাতীয় সঙ্গীত। রঙ্গলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল এবং অনেক কবি গায়ক এই গান গেয়েছেন। কিন্তু তারই মধ্যে নজরুল - মুকুন্দদাস শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রামের ধারাও নিয়ে এলেন। সাম্রাজ্যবাদ - শোষণ-দীর্ণ এদেশের সমাজ - গর্ভে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামও এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গানের ধারাও নতুন রূপ নিতে থাকে। প্রথম প্রথম এই ধারাকে স্বদেশী গানই লোকে বলত। স্বদেশী সঙ্গীতের মধ্যে এই পৃথক বৈশিষ্ট্যের গানের ধারার কোনও সংজ্ঞা তখন দেওয়া যায়নি বটে, তবে ক্রমে ক্রমে গানের ধারার এই পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রকট হতে থাকল। শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের এবং জয়যাত্রার গানের নাম হয়ে গেল গণসঙ্গীত। এদেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি থেকে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের সমাবেশ - যে সমাবেশ এদেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ্রের আহ্বানে গড়ে উঠেছিল- সেখানেই বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী প্রমুখ স্রষ্টাদের অবদান। যুদ্ধ-মন্বন্তর-মহামারীতে ক্ষত বিক্ষত সমাজকে বদলে দেবার আহ্বান নিয়ে যে সব গান রচিত হতে থাকল- তারই নাম গণসঙ্গীত। যুদ্ধশেষে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয় বিশ্বের পরাধীন মানুষের সাথে এ দেশের মানুষের মধ্যেও সংগ্রামের জোয়ার আনল। মুক্তি সংগ্রামের গান, তেভাগা সংগ্রামের গান, সলিল চৌধুরীর গানে ভেসে গেল দেশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতেও গণসঙ্গীতের স্রোতধারা বইতে লাগল। স্বাধীনতা এসে গেল। শ্রমজীবী মানুষের জীবনে সেই অন্ধকারের কোনও পরিবর্তন হল না। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পর কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সেই গণনাট্য সঙ্ঘকেও বেআইনি ঘোষণা করা হ'ল। মানুষের আন্দোলনের ফলে সরকার ঘোষিত ঐ অবৈধতা ঘুচে গেল। কারারুদ্ধ বন্দীরা একে একে ছাড়া পেতে থাকলেন। এ জেলায় গণসঙ্গীত শিল্পীরা নাট্যশিল্পীদের সাথে একত্রে মিলে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা সংগঠিত হ'ল। অতীন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘও এখানে গড়ে উঠেছিল। অতীন্দ্র মজুমদার কলকাতায় পড়তে গিয়ে সেখানকার গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন, গণসঙ্গীতের ধারা শিক্ষা করেন। জেলায় ফিরে এসে ক্রান্তি শিল্পীসঙ্ঘ গঠন করেন। গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা প্রথমে গড়ে ওঠার পর এখানকার প্রতিষ্ঠিত মহল গণনাট্য সঙ্ঘকে আমল দেয়নি প্রথমে। তারা গণসঙ্গীতকে স্লোগানধর্মী, নিম্নমানের সঙ্গীত বলে মনে করতেন, উন্নাসিক দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে শুধু গ্রামের কৃষকের কাছেই নয়, শহরের পাড়ায় - পাড়ায়, ক্লাবে - ক্লাবে, স্কুল-কলেজে ডাক পড়তে লাগল গণনাট্য সঙ্ঘের। তাদের স্থান অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল সৃষ্টিশীল গণসঙ্গীতের ধারায়। বর্তমানে আরও কিছু ক্লাব ও সঙ্ঘ গণসঙ্গীত গাইছেন। কলকাতার রুমা গুহঠাকুরতার ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার - এর অনুসরণে এখানে বহরমপুর ইয়ুথ কয়্যার নামে একটি সংস্থা গণসঙ্গীত গাইতে শুরু করে। বেলডাঙ্গাতেও একটি সংস্থা গণসঙ্গীত গাইতে থাকে। ফরাক্কাতেও একটি সংস্থা এই গান গেয়ে থাকে। ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের নেতৃত্বে ছিলেন অতীন্দ্র মজুমদার। ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য। জাগরণ নামে অতীন্দ্র মজুমদার রচিত

সঙ্গীতমালা নাম করেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯৪৪ - এ প্রথম ফ্যাসী বিরোধী লেখক শিল্পী সম্মেলনে কলকাতায় সুশান্ত পাঠক ও সুধীন সেন মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রতিনিধি হয়ে যান। সুশান্ত পাঠক লেখক ছিলেন। সুধীন সেন ছিলেন গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাছে গানের সম্ভার সংগ্রহ করে গ্রামে গ্রামে কৃষক সম্মেলনে তিনি গান গেয়ে এসেছেন। ১৯৫১ সালের ৩১ শে মে তারিখে ভারতীয় গণনাট্য সঙেঘর মুর্শিদাবাদ জেলা সংগঠনী কমিটি গঠিত হ'ল। সৈদাবাদের এস্‌রাজ শিল্পী ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় সভাপতি এবং সুধীন সেন সম্পাদক হন। সহ-সভাপতি হিসাবে ধনপতি সান্যাল, সুধীর মুখার্জী, শৈলেশ রাহা, গোপীরমন সান্যাল এবং সহ-সম্পাদক রূপে কমল সমাজদার নির্বাচিত হন। লালগোলার অলক সান্যাল গণনাট্য সঙেঘ যোগ দেন। তিনি শুধু সুকণ্ঠ গায়ক নন, ছিলেন ভাল গীতিকারও। অগ্নি(রা গান গেয়ে তাঁর সুনামও হয়। গণসঙ্গীত মূলত সুর নিয়েছে ক্লাসিক্যাল ও লোকসঙ্গীতের প্রবাহ থেকে। তবুও তার বাণী বা বিষয়বস্তু তথা নতুন ভঙ্গিমা তার আঙ্গিককেও বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চা

বহরমপুর মহকুমা ঃ

১৮২০ - ২১ সালে বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ারে (তৎকালীন সেনানিবাস) ম্যাগাজিন বিল্ডিং-এর কাছে একটি অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে ইংরাজী নাটক মঞ্চস্থ করত ইংরেজরা। এখানকার মঞ্চস্থ নাটকে তৎকালের বিশিষ্ট অভিনেত্রী এসথার লীচ অভিনয় করতেন। এই নাটকের টিকিট বিক্রি হ'ত।

মুর্শিদাবাদ জেলা দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত। নবাবী আমলের নাট্যচর্চার কোন ইতিহাস না পাওয়া গেলেও জেলার নাট্যচর্চা রাজা মহারাজা - জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়নি। বহরমপুর কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উৎসাহে গিরীশচন্দ্র ঘোষের অন্যতম প্রিয় শিষ্য গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহরমপুরে আগমন এখানকার নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। গোবর্ধন বাবু গিরীশচন্দ্রের বাগবাজার-এর দলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। বহরমপুরের নাট্যঐতিহ্য গোবর্ধন বাবুর শিক্ষার ফল। মহারাজা গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অধ্যক্ষ করে ১৮৯৯ সালে বহরমপুরে একটি নাট্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন (বহরমপুর খাগড়া মোড়ে অবস্থিত এই বাড়ীর পরবর্তী নাম ছিল বহরমপুর আর্ট একাডেমী বা জলেশ্বর মল্লিকের স্টুডিও)। এই নাট্য বিদ্যালয়টি ২৫ বছর চলেছিল। বলা বাহুল্য নাট্যচর্চার বিদ্যালয় হিসাবে এটি প্রথমিকতার দাবী জানাতে পারে। অপেশাদারী নাটকের প্রচারের সঙ্গে কাশিমবাজারে নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র তাঁর দল নিয়ে নিয়মিত অভিনয় করে যেতেন। আসতেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃতলাল বসু এবং স্টার থিয়েটার তাদের দল নিয়ে। গোবর্ধন বাবু ও মহারাজার ইচ্ছায় সেদিনের বহরমপুরের শিল্পী দল গিরীশচন্দ্রকে দেখাবার জন্য কলকাতায় রিজিয়া নাটক মঞ্চস্থ করেন। কলকাতায় কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে অভিনয়ের ব্যবস্থা হ'ল। গিরীশচন্দ্র, তারাসুন্দরী প্রমুখ গণ্যমান্য শিল্পী ও রসগ্রাহী শ্রোতা-দর্শক উপস্থিত ছিলেন সেদিনের নাট্যাভিনয়ে। রিজিয়ার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তিনি মহিলা শিল্পী নন - পুরুষ। তাঁর নাম গনেশ মিস্ত্রি। তিনি ছুতোরের কাজ করতেন। লেখাপড়া একদমই করেন নি। গোবর্ধন বাবুর শিক্ষার গুণেই গনেশ মিস্ত্রির ঐ অভিনয় নৈপুন্য। বক্তিয়ার করেছিলেন সৈদাবাদের নলিনী ঠাকুর।

১৯১১ সালে এডোয়ার্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের (বা গ্র্যান্ট হল) প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৭ সালে নাম পরিবর্তন করে হয় যোগেন্দ্রনারায়ণ মিলনী। এখানে অভিনীত নাটকের মধ্যে ছিল সাজাহান, টিপু সুলতান, অন্ধ কুনাল, তাইতো, কর্ণার্জুন, গৈরিক পতাকা, বেকার নাশন কোম্পানী, ক্রম নং নাইন, দত্ত স্টেটের উইল প্রভৃতি। সদস্য নাট্যকার ছিলেন কৃষ্ণনাথ কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ রায়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন দীননাথ বন্দ্যোপাধায়, কালী মুখোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে কলকাতার বিখ্যাত পেশাদার অভিনেতা), রাধাকান্ত সরকার, গোপিকারমন সান্যাল, অমর নিয়োগী, সত্য ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্ল মজুমদার (মোসিনবাবু), রবি রায়, পান্নালাল মুখার্জী (বোমফুল), বীরেন ঘোষ প্রভৃতি। এই মঞ্চে মহিলা শিল্পীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

১৯১৪-১৫ সালে বহরমপুরে দু'টি নাট্য সংস্থার সন্ধান মেলে। প্রথমটি অবৈতনিক নাট্য সমাজ, দ্বিতীয়টি কাশীনাথ থিয়েটার। নাট্য সমাজের পরিচালক ছিলেন রাধাকান্ত সরকার। পরে রাধাকান্তবাবু কাশীনাথ থিয়েটারের পরিচালক হন। অবৈতনিক নাট্যসমাজ ২০ রাত্রি সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত নাটক মঞ্চস্থ করে। কাশীনাথ থিয়েটার ক্ষীরোদপ্রসাদের ব(ণা নাটকটি অনেকবার মঞ্চস্থ করে।

১৯১৯ সালে স্বর্ণময়ী ক্লাব মঞ্চস্থ করে চন্দ্রগুপ্ত নাটক। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের আগ্রহে ও উদ্যোগে বানজেটিয়ায় যে অল ইণ্ডিয়া এক্‌জিবিশন হয় ১৯২১ সালে সেখানে কলকাতার পেশাদার দল ও নিমতিতার নাটকের দলের অভিনয় হয়েছিল।

বহরমপুরের বিশিষ্ট আইনজীবি বৈকুণ্ঠনাথ সেন নিজে অভিনয় না করলেও উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২৩ সালে বহরমপুর সৈদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয় বৈকুণ্ঠ মেমোরিয়াল ক্লাব বা বি.এম.ক্লাব। এরা মঞ্চস্থ করেছিলেন কর্ণার্জুন, ষোড়শী, কারাগার,

পুনর্জন্ম, তটিনীর বিচার, বিসর্জন, রীতিমতো নাটক প্রভৃতি।

১৯২৪ এ স্থাপিত হল শশিভূষণ রিক্রিয়েশন ক্লাব। প্রথম নাটক দুর্গাদাস। পরের নাটকগুলি হল কণ্ঠহার, রমা, মুক্তির আলো, পি.ডব্লু.ডি. ইত্যাদি।

১৯৩১-৩২ সালে খাগড়া মটুরাপাড়ার ভূপেন চক্রবর্তী রাজলক্ষ্মী থিয়েটার শুরু করেন। জেলার বিশিষ্ট শিল্পীরা ওখানে নাটকে অংশগ্রহণ করতেন। ভূপেন চক্রবর্তী, নসীপুরের যতীনবাবু, লালবাগ সাহানগরের ননীবাবু, বহরমপুরের তারাপদ চ্যাটার্জী, আশু দত্ত, কালীপদ বৈরাগী, নফর দাস প্রভৃতি ছিলেন শিল্পীদলে। মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন ননীবালা, চারুবালা, জিয়াগঞ্জের রাধারাণী (খুদু) প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ। প্রথম নাটক ফুল্লরা। তারপর সিন্ধুগৌরব, সাজাহান, প্রভৃতি নাটক। শোনা যায় একবার সাজাহান নাটকে সাজাহান চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী এবং পিয়ারার ভূমিকায় রাধারাণী অভিনয় করেছিলেন। এই নাটক দেখেই সম্ভবত অহীন্দ্র চৌধুরী রাধারাণীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এই নাট্যাভিনয়ে টিকিট থাকত, যার মূল্য এক টাকা। কিছুদিন চলার পর রাজলক্ষ্মী থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৪ সালে শশিভূষণ রিক্রিয়েশন ক্লাবের কিছু অভিনেতা বেরিয়ে এসে ডোমন প্রসাদ মেমোরিয়াল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে যে সব নাটক অভিনয় হয়েছিল তার বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন ডাঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোড়শী কুমার মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ সমাজদার, কটা ভট্টাচার্য, বিধু বাগচী, ডোমন প্রসাদ মৈত্র, যামিনী মজুমদার, শান্তনু কারফরমা, প্রবোধ ঠাকুর, নৃপেন্দ্র বসু সর্বাধিকারী প্রমুখ।

গোবর্ধন মাষ্টারের পর রাধাকান্ত সরকার বা কান্ত মাষ্টার - এর নাট্য শিক্ষায় বহরমপুরে যে নাট্যচর্চা চলেছিল তার মান যথেষ্টই উন্নত ছিল। সেই নাট্যচর্চার ফসল হিসাবেই আমরা পাই অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নট'কে তিনি (বহরমপুরে পটলা বলেই সমধিক পরিচিত ছিলেন)' যিনি পরবর্তীকালে কলকাতার পেশাদার রঙ্গ মঞ্চের অনেক বিখ্যাত নাটকের নায়ক। রাধাকান্ত মাষ্টারের বাবা ষষ্ঠীচরণ সরকার ছিলেন নাচ ও গানে পটু। গোবর্ধন মাষ্টারের আলিবাবা নাটকে তিনি মর্জিনার ভূমিকায় অভিনয় করে সকলকে অবাক করে দেন। রাধাকান্ত মাষ্টার কাঞ্চনতলা, নিমতিতার জমিদার বাড়ী, লালগোলার রাজবাড়ী - বহু জায়গাতেই নাটক শিখিয়েছেন।

১৯৪৪এ প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের জোনাল সম্মেলনে বিজন ভট্টচার্যের নবান্ন নাটক অভিনীত হয় স্থানীয় সূর্য সিনেমা হলে।

১৯৪৬ সালে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ মঞ্চস্থ করে মনোজ বসুর ভুলি নাই উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অরুণ দাশগুপ্ত। বহরমপুরে এই প্রথম মহিলা শিল্পীদের দিয়ে মহিলা চরিত্রে রূপদান। এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন যোড়শী মজুমদার, অতীন্দ্র মজুমদার, অরুণ দাশগুপ্ত, মঙ্গলময় মৈত্র, সলিল সেন, নিতাই বাগচী, ছন্দা বাগচী, কেয়া দাশগুপ্ত, হাসি দাশগুপ্ত প্রমুখ।

১৯৪৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী বহরমপুর সার্কাস ময়দানে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের ছাত্র সংগঠন-এর সারা বাংলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে অভিনীত হয়েছিল অতীন মজুমদার রচিত 'আগামী কাল' (জাগরণ) গীতি নাটক। সে দিনের দর্শকাসনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা সওকত ওসমানী, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। যে দলটি এই নাটকটি পরিবেশন করেছিলো তাদের কোন নাম ছিল না। সম্মেলনের পরদিন বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক নেতা ত্রিদিব চৌধুরী ঐ দলের নামকরণ করলেন ক্রান্তি শিল্পী সংঘ। এইভাবেই ক্রান্তি শিল্পী সংঘের জন্ম হ'ল ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭। ক্রান্তি শিল্পী সংঘের জন্ম জেলার নাট্যচর্চায় এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১২ই ফেব্রুয়ারী পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় অতীন মজুমদারের ঐ নাটক 'জাগরণ' নামে মঞ্চস্থ না হয়ে 'আগামী কাল' নামে হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই গীতি নাটকটি জেলায়, জেলার বাইরে এমনকি রাজ্যের বাইরেও বহু রাত্রি অভিনীত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ 'ভুলি নাই' নাটকে প্রথম মহিলা শিল্পীদের মঞ্চে এনেছিল, কিন্তু ক্রান্তি শিল্পী সংঘ ব্যাপক ভাবে এখানে সাধারণ মঞ্চে মহিলাদের দিয়ে অভিনয় করায়। ১৯৪৯ সালের ৭ ই ও ৮ই আগষ্ট ক্রান্তি শিল্পী সংঘ-এর আর এক উল্লেখযোগ্য উপহার রবীন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বনে 'বাইশে শ্রাবণ'। নাট্যকার অরুণ দাশগুপ্ত ও দিলীপ সিংহ। ১৯৫০ - ৫১ সালে ক্রান্তি শিল্পী সংঘের শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্প অবলম্বনে অতীন্দ্র মজুমদারকৃত নাট্যরূপ জেলায়, জেলার ও প্রদেশের বাইরে অভিনীত হয়েছে।

১৯৫১ এ জন্ম নিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা। সংঘ ১৯৫২ সালে প্রথম প্রযোজনা করে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'। গণনাট্য সংঘ ১৯৫৪ সালে মশাল, ৫৫তে 'মুক্তির উপায়', '৫৮তে আজকাল, '৬১ সালে 'রক্তকরবী' ও শ্যামা (নৃত্যনাট্য) মঞ্চস্থ করে বহরমপুরের নাট্য পরিমণ্ডলে গণনাট্য আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখে।

বহরমপুর লালদীঘি অঞ্চলের ছেলেরা ড্রামাগিল্ড স্থাপন করে প্রয়াত কবি মণীশ ঘটকের পুত্র অবু ঘটকের পরিচালনায় ইংরাজী নাটক 'নাইট অ্যাট এ্যান ইন' মঞ্চস্থ করে স্থানীয় মীরা সিনেমা হলে ১৯৫২ সালে।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে নাটকে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। গণনাট্যের যুগ শেষ হয়ে নবনাট্য পেরিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের পরিকাঠামো তৈরী হতে শুরু করেছে।

১৯৫৯ সালে ক্রান্তি শিল্পী সংঘের অধিকাংশ শিল্পী বেরিয়ে

এসে গড়ে তুললেন রূপশিল্পী। প্রথম নাট্য নিবেদন ধনঞ্জয় বৈরাগীর '(পোলী চাঁদ' স্থানীয় সূর্য সিনেমা হলে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৫৯ সালে জেলায় প্রথম একাঙ্ক নাটকও মঞ্চস্থ করেছিল 'রূপশিল্পী'। নাটকের নাম 'মাটির মায়া, অভিনীত হয়েছিল কলকাতার থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে। রূপশিল্পীর উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক প্রযোজনার মধ্যে আছে 'সাম্রাজ্ঞী', 'মন নিয়ে খেলা', সিঁড়ি, 'পুনর্জন্ম', 'রাজযোটক', 'নৈশভোজ', মহাকাব্য, 'ঝুমুর' ইত্যাদি। পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা দুই মহল, মহেশ, বড়ো পিসিমা, বাকি ইতিহাস, দালিয়া, নরক গুলজার, সাজানো বাগান, পাথরের চোখ, ঝর্ণা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, সরীসৃপ, প্রভৃতি। নৃত্যনাট্য — শ্যামা, শাপমোচন, কালমৃগয়া, চণ্ডালিকা, ভানুসিংহের পদাবলী, বাল্মীকি প্রতিভা ইত্যাদি। শিশু নৃত্য নাট্য হিংসুটে দৈত্য। ১৯৬৫ সালে, আকাশবানী কলকাতা কেন্দ্র'র যুবগোষ্ঠী অনুষ্ঠানে রূপশিল্পী বেতারনাটক 'কর্মখালি' পরিবেশন করে।

১৯৬১-৬২-৬৩ সালে কলকাতার বঙ্গীয় নাট্য সংসদ ও বহরমপুর যোগেন্দ্র নারায়ণ মিলনীর যৌথ উদ্যোগে জেলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে বহরমপুরের নিন্দু পরিষদ, কালেক্টরেট ক্লাব, প্রান্তিক, আনন্দম্ একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। জেলার বেলডাঙ্গায় বেশ কিছুদিন এবং ফরাক্কায় নিয়মিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা চলছে।

১৯৬৮ সালে বহরমপুরে প্রান্তিক ও ছান্দিক নামে দু'টি নাট্য দল জন্ম নেয়। প্রান্তিক শু(করে 'কিন্তু নাটক নয়' দিয়ে। তারপর তাদের প্রযোজনা 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', 'গণ্ডার', 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'দরজায় করাঘাত' 'হারাধনের নাতজামাই', 'চাকভাঙ্গা মধু', তারপর দিব্যেশ লাহিড়ী রচিত মালদহের গম্ভীরা আঙ্গিকে 'নানা হে' অসংখ্য পুরষ্কার ও প্রশংসায় ভূষিত হয়। পরবর্তীতে 'জানালা', 'অ(মেধ', 'গুপ্তচর', 'রক্ত(করবী', 'বিসর্জন' 'রাজা', 'দায়' প্রভৃতি। প্রান্তিকের 'পাঁক' নাটকটি মণিপুরে যুব নাট্যোৎসবে পরিবেশিত হয়।

শক্তি(নাথ ভট্টাচার্যের 'শূন্যে বিহার' নাটক দিয়ে ছান্দিকের যাত্রা শু(। নানা স্বাদের নাটক উপহার দিয়ে ছান্দিক উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'আসামী হাজির', 'হইতে সাবধান', 'নয়ন কবীরের পালা', 'দশমুণ্ডু', 'মে দিবস', রথের রশি, শেষ দেখা হয় নাই, বিসর্জন, 'রক্ত(করবী', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'সত্রে(তিশ', 'আর্কিমিডিসের মৃত্যু' ইত্যাদি। ছান্দিকের 'অচলায়তন' রাজ্য নাট্য আকাদেমী কর্তৃক পুরস্কৃত ও এই নাটক নিয়েই ছান্দিক বাংলাদেশ সফর করে।

১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শা(ত। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা-বাদক, উপজিল, বিষহরি, কর্ণিকা, বারাব্বাস, প্রভৃতি।

১৯৭২ এ বহি(দলের আত্মপ্রকাশ। এদের মঞ্চস্থ নাটক অবশেষে, ছেঁড়া তমসুক, মহেশ, চরিত্রের বিদ্রোহ।

১৯৭২ এ স্থাপিত হয় স্বস্তিক। প্রযোজিত নাটক 'কাবুলিওয়ালা', 'শাস্তি', 'তবুও কেন', 'যোগীন যখন যজ্ঞে(র', 'সদর দরজা'।

১৯৭৪ সালে জন্ম নেয় যুগাগ্নি। পথ নাটক ও মঞ্চ নাটক নিয়ে যুগাগ্নির ঝুলিতে অনেক নাটক। অনেক সার্থক প্রযোজনা। আশির দশক থেকে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা খোদার মর্জি মজদুর সাথী, খণ্ডযুদ্ধ, বিছন, হরিপদর শীতবস্ত্র, গণ্ডী, মা অভয়া, তিন পয়সার পালা প্রভৃতি।

১৯৭৬ - এ এল সুহৃদ। উল্লেখ্যযোগ্য প্রযোজনা স্বর্গলাভ, নাজি ৭৪, যখন অন্ধকার, অব(দ্ধ ইতিহাস, তোতা কাহিনী, কানামাছি খেলা, উষ(ভূমি ইত্যাদি।

১৯৭৭ এ জন্ম লাভ করে 'মঞ্চে এলাম'। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলি হল হাঙর, রামরাজ্য, নন্দরাণী, কর্ণিক, গাব্বু খেলা, প্রভৃতি।

১৯৭৭ এর আর একটি দলের প্রতিষ্ঠা হয়। নাম ঋত্বিক নাট্য গোষ্ঠী। প্রযোজনা রাজদর্শন, বিলাসী, জ্বালা, বিষু(প্রিয়া ইত্যাদি।

১৯৮০তে প্রতিষ্ঠিত সপ্তর্ষির প্রযোজনা গুলি হ'ল একটি নীড়ের সন্ধানে, একালের একলব্য, প্রজন্ম, কসাই, বৃত্তের চারিদিকে।

১৯৮০তেই ঋত্বিক আসে বহরমপুরের নাট্য জগতে। উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা জামগাছ, নিছক ভূতের গল্প নয়, স্ত্রীর পত্র, গোরা, কার্ল মার্কস, বিসর্জন, সীমা চৌহদ্দি, ৩০শে জানুয়ারী, আত্মবিম্ব, ব্যাস প্রভৃতি। নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে সৃজনশীলতার বাতাবরণ তৈরী করে বিষয় আর আঙ্গিকের সুসামঞ্জস্য মেলবন্ধন করে চলেছে এরা।

১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠা হয় নান্দনিক এর। শু(নৃত্যনাট্য 'শাপমোচন' দিয়ে। পরবর্তীতে নৃত্যনাট্য নাটক উভয়ই প্রযোজিত হতে থাকে। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'সেই রাজার দেশে', 'মর্জিনা আবদাল্লা', 'অ(ণ ব(ণ কিরণমালা', 'মায়ার খেলা', 'গুপী গাইন, বাঘা বাইন', 'দেবতার আত্মগোপন', 'তোতাকাহিনী' প্রভৃতি।

১৯৮৪ সালে স্থাপিত হয় নবীন। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'ভাতুয়া', 'ধর্ষিতা', 'ঢাকের বাদ্যি', 'পৌনপুনিক', 'আড়ি মূর্ত্তি', 'হা(ণ অল রসিদ' ইত্যাদি।

১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বহরমপুর রেপার্টারী থিয়েটার। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে আছে 'মুক্ত(ধারা', 'স্বরবর্ণ', 'তোতাকাহিনী', 'চাঁদ সওদাগর'। মালদহের গম্ভীরা আঙ্গিকে 'দংশন' নাটক রাজ্য নাট্য আকাদেমী কর্তৃক পুরস্কৃত। মুর্শিদাবাদের আলকাপের আঙ্গিকে 'মায়া' নাটক জেলায় ও জেলার বাইরে বহু জায়গায় অভিনীত ও প্রশংসিত।

১৯৯৪ সালে জন্ম নেয় উজান। গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা ‘আজকের শাজাহান’, ‘টিনের তলোয়ার’, ‘অমৃত অতীত’, ‘সূর্য্যশিখর’ প্রভৃতি।

২০০১ সালে স্থাপিত ‘থিয়েটার বহরমপুর’। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা নয়ন কবীরের পালা, আত্মদাহ, দেওয়ান গাজীর কিসসা।

শিশু নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে জেলার অগ্রণী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৩ এ স্থাপিত বহরমপুর ছাড়পত্রের প্রথম প্রযোজনা ‘বুদ্ধভুতুম’। পরে উল্লেখ্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে আছে ‘যাদুর তুলি’, ‘পাষাণপুরী’, ‘স্বপ্নবন্ধু’, ‘দড়াবাজি’, ‘টাপুর ও শয়তান’, ‘ববি’, ‘বোকা মানুষের গপ্পো’, ‘পন্ডিত বিদায়’ ইত্যাদি। এর মধ্যে ‘টাপুর ও শয়তান’ পুরস্কৃত। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত যুবনাশ্ব- এর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছোটদের নাট্য শিক্ষা ও কর্মশালা। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলি হল ‘তালে বেতাল’, ‘খ্যাতির বিড়ম্বনা’, ‘ছাত্রের পরীক্ষা’, ‘লঙ্কাদহন’, প্রভৃতি।

বেলডাঙ্গা ঃ এই শতাব্দীর একেবারে শুরুতে না হলেও দু’এর দশকের শুরুতেই বেলডাঙ্গায় নাটকের প্রথম প্রযোজনা শুরু হয়। ১৯২৪ সালে প্রমথনাথ ভাদুড়ী, অতীশ ঘোষ, মণীন্দ্র মোহন হাজরা, গৌর আঢ্য, গোকুল চ্যাটার্জী প্রমুখেরা প্রতিষ্ঠা করেন অন্নপূর্ণা থিয়েটার। প্রথম প্রযোজনা গিরীশ ঘোষের ‘প্রফুল্ল’। হাজরা বাড়ীতে মঞ্চস্থ হয় নাটকটি। দ্বিতীয় প্রযোজনা ‘নরনারায়ণ’, পরের নাটক ‘চন্দ্রগুপ্ত’ ‘টিপু সুলতান’। কিছুদিন বন্ধ হয়ে থাকার পর ১৯৩০-৩২ সালে আবার নাটক শুরু হয়। প্রযোজিত নাটক কর্ণার্জুন। অভিনয়ের স্থান ছিল ক্ষিতীশ ঘোষ বাবুদের বাগানবাড়ী। ডাইনামো থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে আলোক সম্পাত করা হয়েছিল। অন্নপূর্ণা থিয়েটার থাকা কালীনই ভারতী নাট্যমন্দির শুরু হয় অজিত ঘোষ, নিমাই রায়, বদ্রীনারায়ণ খাঁন প্রমুখের উদ্যোগে। প্রথম নিবেদন ‘সিরাজ- উদ্-দৌল্লা’, দ্বিতীয় প্রযোজনা ‘কারাগার’। ১৯৫০ সালের পর বেলডাঙ্গার নাট্য জগতে পরিবর্তন আসে। ব্যবসাসূত্রে কলকাতা থেকে অনিল বরণ দত্ত নামে এক নাট্যকার পরিচালক বেলডাঙ্গায় এসে স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত করে প্রতিষ্ঠা করেন মিলনী নামে একটি নাট্যদল। প্রথম প্রযোজনা করলেন ‘সাজাহান’ নাটক। তাঁরই লিখিত ‘স্থান কোথায়’ অভিনীত হয়। সম্ভবত এটাই বেলডাঙ্গায় প্রথম পাণ্ডুলিপি থেকে অভিনয়। এই সময়ই নাটকে পুরুষ অভিনেতা কর্তৃক মহিলা চরিত্রে অভিনয়ের দিনও শেষ হল। কলকাতা থেকে অভিনেত্রী মাধবী চক্রবর্তী (মুখার্জী) জয়শ্রী রায়, গীতা প্রধান প্রমুখ বেলডাঙ্গায় এলেন অভিনয় করতে। প্রযোজিত হল স্বাস্থ্যশ্রী কর্তৃক ‘উল্কা’, প্রদীপ টকীজ হলে। স্বাস্থ্যশ্রী এরপর মঞ্চস্থ করল ‘দীপান্তর’, ‘কংকাবতীর ঘাট’, ‘সিরাজ-উদ্-দৌল্লা’। ‘এরাও মানুষ’, ‘উল্কা’, ‘রুপোলী চাঁদ’ প্রভৃতি। স্বাস্থ্যশ্রীর পাশাপাশি একই সময়ে আবির্ভূত জয়হিন্দ পাঠাগার পরে জগবন্ধু বাণী মন্দির মঞ্চস্থ করে ‘শ্যামলী’।

১৯৫৭ সালে বেলডাঙ্গায় সুগার মিলের মাঠে বামপন্থী মৎস্যজীবি সম্মেলনে ‘ধর্মঘট’ নাটক মঞ্চস্থ হল। এই সময়ই বেলডাঙ্গায় জন্ম নিল ক্রান্তি শিল্পী সংঘ। সংঘ ‘মৌচোর’ নাটকটি অভিনয় করল বেলডাঙ্গায়। ১৯৬০ নব্যসমিতি মঞ্চস্থ করল ‘বারোঘন্টা’। এই সময়টাকে অনিল বরণ দত্তের সময় হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। তাঁর নির্দেশনায় প্রদীপ টকীজে অভিনীত হল ‘কাঞ্চনরঙ্গ’, ‘ফিঙ্গারপ্রিন্ট’। কলকাতা থেকে আলো ও আবহ প্রক্ষেপণের নেপথ্য শিল্পী এসেছিলেন। সালটি ১৯৬২-৬৩। বেলডাঙ্গার শিল্পীরা কলকাতার প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে অভিনয় করলেন ‘এ কি হ’ল’, ‘স্বীকৃতি’ ও ‘নীরবে নিভৃতে’। এই সব নাটকের রিহার্সাল হয়েছিল কলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটের একটি ঘরে। এরাই রঙমহল মঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন ‘মুখপ্যাক এন্টারপ্রাইজ’ নাটক। ১৯৭০-৭১ সালে শ্রী অরুণ গাঙ্গুলী স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক ও কিছু প্রাক্তনে অভিনেতাদের নিয়ে মঞ্চস্থ করালেন ‘ভাড়াটে চাই’, ‘বিনয় বাদল দীনেশ’, ‘অভাগীর স্বর্গ’ প্রভৃতি নাটক। এরপর বেলডাঙ্গায় গ্রুপ থিয়েটারের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। নেতাজী পার্কের সভ্যরা পার্ক ময়দানে ১৫ই মে’, ৭৫এ মঞ্চস্থ করল নতুন যুগের নাটক, সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ‘লিঞ্চিং’। এরপর নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নেতাজী পার্ক ১৯৭৬ সাল থেকে প্রতিবছরই নতুন নতুন একাঙ্ক নাটক বা পূর্ণাঙ্গ নাটক করে আসছিল। এরমধ্যে ‘জ্বালা’, ‘ডাইনোসেরাস’ উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। ৮০-৮১ সালে নেতাজী পার্কের নাট্যদলের নাম দেওয়া হল নেনাস। নেনাস’র উদ্যোগে ১৯৭৯ সাল থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা হয়ে চলেছে। নেনাস নিজেও কিছু উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৯৮৮ সালে ‘নহবৎ’ এবং ‘রাজা অয়দিপাউস’ মঞ্চস্থ হয়।

লালবাগ মহকুমা ঃ

১৯১৯ সালে বান্ধব সমিতির প্রতিষ্ঠা। সমিতি খেলাধূলা ও নাট্যচর্চা দুই-ই করত। ১৯২৬ - ২৭ সালে প্রথম নাটক ‘হিন্দুবীর’। ১৯৩৮ সাল থেকে লালবাগের জমিদার ধরণী ঘোষের বাড়ীতে নাট্যচর্চা চলতো। ধরণীবাবুর দুই পুত্র ও ভাই নাট্যরসিক ছিলেন। এদের প্রথম নাটক ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ও ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’। অভিনয়ে ছিলেন দুর্গা সেন, শেখর কুমার ঘোষ, স্ত্রী ভূমিকায় সুধীর ব্যানার্জী, বিশ্বেশ্বর সরকার, চুনান সেখ প্রভৃতি। ১৯৫৩-৫৪ ও তৎপরবর্তী সময়ে বান্ধব সমিতি মঞ্চস্থ করে ‘সীতারাম’, ‘দেবলা দেবী’, ‘সাজাহান’, ‘কর্ণাজুন’, প্রভৃতি। ১৯৫৯ সালের ১৭ই জানুয়ারী নাট্যচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী লালবাগে আসেন। ধরণী ঘোষের পুত্র অরুণ ঘোষ তাঁদের কাছারী বাড়ী ভেঙে একটা পাকা মঞ্চ তৈরী করেন। মঞ্চের নামকরণ হয় পারুল-শেখর স্মৃতি মঞ্চ। নতুন

সংস্থাও তৈরী হয় অরুণ আর্ট সেন্টার। এই মঞ্চ উদ্বোধন করেন শিশির কুমার ভাদুড়ী ১৮ই জানুয়ারী ১৯৫৯। এইখানেই অভিনীত হল 'সাজাহান' নাটক। সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করেন শিশির কুমার ভাদুড়ী। ঔরঙ্গজেব অরুণ ঘোষ, দিলদার দুর্গা সেন এবং জাহানারা রেবা দেবী। এই মঞ্চে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক অনেক নাটক প্রায় দেড়'শ রজনী অভিনীত হয়েছে। মফঃস্বলে শিশির কুমারের এই মঞ্চেই শেষ অভিনয়। এই মঞ্চে পরবর্তীকালে বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় যেসব নাটক অভিনয় হয়েছে তার মধ্যে 'মন বেঁধে দিল', 'কর্ণার্জুন', 'হঠাৎ দেখা', কৃপণের ধন', 'নিষ্কৃতি', দেবলা দেবী', 'চিকিৎসা সংকট', 'হায়দার আলী', 'মরা হাতি লাখ টাকা' প্রভৃতি। এখানকার কিছু নেই

জিয়াগঞ্জ ঃ জিয়াগঞ্জের পুরোনো দিনের নাট্যে শ্রীকান্ত ভাস্কর ও সাধুবাবুদের প্রচেষ্টায় বালুচরে নাট্যচর্চার এক উজ্জ্বল ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৯২৮ সাল থেকে বালুচর নাট্যভারতী বা বালুচর ভারতী নাট্য সমাজ অভিনয়ে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। ১৯৫৭ সালে রঙ্গাজীব নাট্যগোষ্ঠী জিয়াগঞ্জে নাট্যোৎসবের আয়োজন করে। ১৯৬২ তে প্রতিষ্ঠিত হয় বহুমুখী নাট্য সংস্থা। এই সংস্থা সেই সময় 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করে স্থানীয় লক্ষ্মী টকিজে। পূর্বের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে যারা বহুমুখী গড়ে ছিলেন তাঁরা পূর্বেও অনেক নাটক করেছিলেন, সেগুলি হল 'ডাকঘর' (১৯৫২), 'মহেশ' (১৯৫৩), 'মুকুট' (১৯৫৪), 'বিরিঞ্চি বাবা' (১৯৫৫), 'পথের ডাক' (১৯৫৬), 'দুই পুরুষ' (১৯৫৭)। বহুমুখীর পর প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'নীলকণ্ঠী', ১৯৬৭ সালে। এদের প্রযোজিত নাটক 'জীবনান্ত', 'ছেঁড়া তমসুক', 'অশান্ত বিবর', 'গন্ধরাজের হাততালি', এবং ইন্দ্রজিৎ' ইত্যাদি। পরবর্তী কালে গড়ে উঠে কাগুজে নাট্য গোষ্ঠী। এদের প্রযোজনা 'নয়ন কবীরের পালা', 'গেব্রিয়াল পেরী', 'রাহুমুক্ত', 'টাকার রং কালো' প্রভৃতি। এর মধ্যে আপনজন গোষ্ঠী নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এখানে। জিয়াগঞ্জের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মহিলা সংস্কৃতি সংঘের দান অনেক। এরা বেশ কিছু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে।

ডোমকল মহকুমা ঃ

চক ইসলামপুর ঃ চকের সার্বজনীন চক কালীতলায় প্রায় ৬৪ বছর আগে স্টেজ বেঁধে নাটকের অভিনয় হয়। ব্যবসায়ী প্রতাপ সাহা তাঁর নাতির বিয়েতে নাটক করিয়েছিলেন। এখানে যে সব ব্যবসায়ী ছিলেন তাঁদের কলকাতায় গদীঘর ছিল এবং কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও ছিল। কলকাতার নাটকও তারা দেখতেন। সেই অনুপ্রেরণায় দেশ স্বাধীন হবার পর এখানে মঞ্চস্থ হয়েছিল 'পলাশীর পরে', 'টিপু সুলতান', 'চন্দ্র গুপ্ত', 'কারাগার', 'পথের দাবী' প্রভৃতি। এখানে বেশীরভাগ নাটকই হল পূজাপার্বন উপলক্ষ্যে। ইসলামপুরেও জমিদার বাড়ীতে পূজা উপলক্ষ্যে নাটক মঞ্চস্থ হ'ত।

ভগীরথপুর ঃ পাটনা থেকে ভগীরথ সাহা ব্যবসা সূত্রে ভগীরথপুরে আসেন ও পরে জমিদার হন। এঁদের উৎসাহে ১৯১০-১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বীণাপাণি নাট্য সমাজ। এখানে 'সিরাজ-উদ্-দৌল্লা', 'রণজিৎ সিং', 'পথের দাবী', প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়। ১৯২১-২২ সালে তৈরী হয় ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাব। এখানে বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়। এদের নিজস্ব সীন, লাইট, বাদ্যযন্ত্র, নাটকের ড্রেস ও স্টেজের জিনিষপত্র ছিল। এখানকার জমিদার বাড়ীতে মেয়েরা প্রথম অভিনয় করে। ঐ সময় জেলার কোন গ্রামে মেয়েরা অভিনয় করতে এগিয়ে এসেছেন বলে জানা যায় না। ১৯৬৬-৬৭ সালে জমিদার বাড়ীর গণ্ডী পেরিয়ে ভগীরথপুরের একদল যুবক শুরু করে মিলনী। মিলনীতে মঞ্চস্থ হয় 'ঘূর্ণি', 'উল্কা' প্রভৃতি নাটক ।

কান্দী মহকুমা ঃ

কান্দীর রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। নাট্যচর্চারও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁরা। কান্দীর রাজবাড়ীতে বিরাট অডিটোরিয়াম সহ একটি মঞ্চ তৈরী হয়েছিল নাট্যাভিনয়ের জন্য। যার উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আবার বিদ্যাসাগরেরই অনুরোধে ঐ হল ও নাট্যমঞ্চ পরবর্তীকালে স্কুল ঘরে রূপান্তরিত হয়। জজান গ্রামে নলিনী মোহন ঘোষ ১৮৯০-৯৫ এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন জজান ড্রামাটিক ক্লাব । তিনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যশিল্পী ছিলেন। এখানে নিয়মিত নাট্যচর্চা হ'ত। ১৯৩৪ সালে অভিনীত হয়েছিল 'রক্তকমল'। এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এড়োয়ালী (খড়গ্রাম থানা), মালিহাটী, কাগ্রাম, টেঁয়াতে (ভরতপুর থানা) কিছু নাট্যচর্চা হয়ে ছিল। জেমো রাজবাটীতে রাজেন্দ্র নাট্যমন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১৯৪৩ সালে গড়ে উঠে জয়হিন্দ পাঠাগার। পাঠাগারের একটি নাট্যবিভাগ ছিল। নাট্য প্রযোজনা হয়েছিল 'দেবলা দেবী', 'সাজাহান', কেরাণীর জীবন' প্রভৃতি। সমসাময়িক ফাল্গুনী সমিতির নাটক হয়েছিল 'মাতা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'কারাগার' 'উত্তরা' ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালে জন্ম নেয় নবীন পাঠাগার। এই সংস্থার উদ্যোগে অভিনীত হয় 'বৈকুন্ঠের খাতা', 'মুকুট', বিদ্রোহী' প্রভৃতি। এই সময়েই বাঘডাঙ্গা সমাজ উন্নয়ন নামে একটি সংস্থা 'পণ দেব না পণ নেব না', 'চোখে আঙ্গুল দাদা', 'আমাকে বাঁচতে দাও' মঞ্চস্থ করে। ১৯৬৩ সালে গড়ে ওঠে রবীন্দ্র সংঘ। প্রযোজিত নাটকগুলি ছিল 'ডাকঘর', 'ফাঁস', 'মরার আগে মরব না'। বাণী সংঘ জন্ম নেয় ১৯৬৮ সালে। অভিনীত নাটকগুলি ছিল 'নীল কুঠীর কান্না', 'ঘুনধরা সমাজ', 'রক্তে রাঙ্গা মাটি'। ১৯৭০ সালে

জেমো বণিকপাড়ায় সর্বোদয় ক্লাবের প্রযোজনায় কিছু নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'ইতিহাস কাঁদে', 'রক্তের আলপনা', 'রক্তে বোনা ধান' উল্লেখ্য। আনন্দলোক (১৯৭১-৭৫) কান্দীতে প্রকৃত নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। জেলার ও জেলার বাইরের নাট্যদল এনে এবং নিজেরা নাটক মঞ্চস্থ করে সিরিয়াস নাট্যচর্চা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য নাটক 'পরাজিত পৃথিবী', 'লাসকাটা ঘর', 'নিহত গোলাপ' 'ফেরা', 'তিতুমীর', 'চে গুয়েভারা', 'কেননা মানুষ' প্রভৃতি। আহদী নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭১ সালে। এদের ভালো প্রযোজনার মধ্যে আছে 'রাজরক্ত'। 'নিতাই পালের পাঁচালী', 'ইয়েনান থেকে শ্রীকাকুলাম', 'মহেঞ্জোদারো', 'গাব্বু খেলা', প্রভৃতি। 'রাইফেল', 'লাল সেলাম', ইত্যাদি যাত্রাও সফলভাবে মঞ্চস্থ করে। ক্রান্তিযুগ শিল্পী সংস্থা ৭৫ সালে জন্ম লাভ করে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে ভেঙ্গে গিয়ে ক্রান্তিযুগ সংস্থার জন্ম হয়। এই দুই সংস্থার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'সওদাগরের দেশে', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'বিসর্জন' ইত্যাদি। কোরাস নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম ১৯৭৮এ। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হ'ল নরক গুলজার', 'মারীচ সংবাদ', 'ফুচিকের লড়াই', 'রক্ত করবী'। পথনাটকও এরা করেছে। অভীক নাট্য সংস্থার জন্ম ১৯৮০ সালে। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে আছে 'অথঃ শিক্ষা বিচিত্রা', 'মড়া', 'সাম্য মায়ের গান'। ১৯৭৮ এ প্রতিষ্ঠা ঝড় নাট্য গোষ্ঠীর। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'চোখে আঙ্গুল দাদা', 'রাজদর্শন', 'হয়তো নয়তো', 'যুদ্ধ লাগার আগে'। রাখালিয়া নাট্য গোষ্ঠী আসে ১৯৮৫ সালেতে। প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে আছে 'মড়া', 'অগ্নিগর্ভ হেকমপুর', 'শাস্তি', 'সেথুয়া', 'গ্যাস চেম্বার'। সুহৃদ সংঘের জন্ম ১৯৭৮এ। অভিনীত নাটক 'রাজার বাড়ী কতদূর', 'ভোরের মিছিল', স্নেহের জন', ৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইয়ংব্লাড নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজিত নাটক 'নীলরক্ত', 'রাজার বাড়ী কতদূর'। এই সালে অর্থাৎ ৭৯তে জন্ম বাঁধাপুকুর যুব নাট্য গোষ্ঠী অভিনীত নাটক 'মহাবিদ্যা', 'হবু চন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী'। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কান্দী শাখারও প্রতিষ্ঠা কাল ১৯৭৯। উল্লেখ্য প্রযোজনা 'গায়ক', 'মাদারী কা খেল' প্রভৃতি ।

পাঁচথুপি ঃ বিংশ শতাব্দীর সময়কালে কলকাতায় এতদঞ্চলের যে সব সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মানুষজন বসবাস করতেন কলকাতার নাট্যশালায় যে সব নাটক দেখতেন সেই সব নাটকের প্রভাব ও অনুকরণ মতো নাটক নিয়ে পুজোর সময় গ্রামে এসে স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত করে নাটক অভিনয় করাতেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে পাঁচথুপি দক্ষিণ পাড়ায়, মল্লিকপাড়ায়, সিংহবাহিনী মন্দির সংলগ্ন পাড়ায় এবং পাঁচথুপি বাণীমন্দিরকে কেন্দ্র করে নাটকের দল গড়ে উঠে। এছাড়াও জনকল্যাণ সমিতি, সিংহবাহিনী মিলনী নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৯৭৬ সালে শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবর্ষে বাণী মন্দির পাঠাগার ও লোকায়ত শিল্পী সংসদের যৌথ উদ্যোগে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও নাটক পরিবেশিত হয়। ১৯৬১ তে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে বাণী মন্দির পাঠাগারের পক্ষ থেকে চিরকুমার সভা এবং বৈকুণ্ঠের খাতা মঞ্চস্থ হয়। ২৫ বছরের অধিককাল পাঁচথুপি গ্রামে গড়ে ওঠা নাট্যদল উদয়নের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই নাট্যদল যুব উৎসবে ব্লক, জেলা ও রাজ্য স্তরে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে এবং পুরষ্কৃত হয়। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এই দল একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করে যাতে জেলার ও জেলার বাইরের নাট্য দল অংশ গ্রহণ করে।

জঙ্গীপুর মহকুমা ঃ

এই মহকুমার নিমতিতার জমিদার বাড়ীতে মহীন্দ্র নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন নিমতিতা হিন্দু থিয়েটার ১৮৯৭ সালে। ১৯০২ সালে জমিদার পুত্র জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ এর বিবাহ উপলক্ষে এই জেলায় প্রথম কলকাতার পেশাদারী থিয়েটার দলের অভিনয় হয় নিমতিতায়। অভিনীত হয়েছিল সাবিত্রী, চৈতন্যলীলা, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি নাটক। জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ ও মহীন্দ্রনারায়ণ পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর বিশেষ গুণমুগ্ধ হন ও শিশির কুমার দু 'এক বার তাঁর নাট্যভারতী দল নিয়ে এসে নিমতিতায় চন্দ্রগুপ্ত, আলমগীর অভিনয় করেন। একবার দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে একাই শিশির কুমার ভাদুড়ী জমিদার বাড়ীতে আসেন। মহীন্দ্র নারায়ণ ও গ্রামবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁদের স্থানীয় দলের সঙ্গে আলমগীর নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। শিশির কুমার ভাদুড়ীর মতো বিখ্যাত অভিনেতার পেশাদার অভিনয় জীবনে কলকাতার বাইরে এসে একটি শৌখিন অপেশাদার দলের অভিনেতাদের সঙ্গে একক ভাবে অভিনয় আর ঘটেনি। নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারে মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে থাকতেন কৃষ্ণনাথ মজুমদার, যিনি অভিনয় কালে ঐ মঞ্চে নৈসর্গিক মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করতেন। এই যুগে আলোর ব্যবহার খুবই কষ্টকর ছিল। হ্যাজাক বা গ্যাসের আলোতে অভিনয় হ'ত। নিমতিতার মঞ্চে ১১০ ভোল্টের একটি জেনারেটর ছিল। কিন্তু সেই জেনারেটর থেকে মঞ্চে শব্দ আসে বলে মঞ্চের আলো স্টোরেজ ব্যাটারী দিয়ে করা হ'ত। মহীন্দ্র নারায়ণের জন্য আলাদা ব্যাটারী ঘর ছিল। এই নিমতিতায় বসেই নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁর অনেক নাটক রচনা করেছেন। এও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। নর-নারায়ণ নাটক তো এই মঞ্চের জন্যই রচিত। ভীষ্ম নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের ৮৯ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় তিনি পরিষ্কার লিখেছিলেন 'মুর্শিদাবাদ নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারের জন্য এই অংশ লিখিত ও উক্ত থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে এই অংশ পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল'। কলকাতার মঞ্চসফল নাটক গুলি

এখানে অভিনীত হ'ত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে তার মধ্যে ঐ মঞ্চে তখন রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। মঞ্চস্থ অন্যান্য নাটক ‘নল ও দময়ন্তী’, ‘শঙ্করাচার্য্য’, ‘বিল্বমঙ্গল’, ‘চৈতন্যলীলা’, ‘প্রতাপাদিত্য’, ‘সাজাহান’, ‘মেবার পতন’, ‘দুর্গাদাস’, ‘রঘুবীর’, চাঁদবিবি’, ‘বঙ্গে রাঠোর’, ‘ভীষ্ম’, ‘রামানুজ’, ‘আলমগীর’, পদ্মিনী’, ‘আলিবাবা’ প্রভৃতি। জঙ্গীপুর মহকুমার উত্তরে ধুলিয়ান থেকে দক্ষিণে সাগরদীঘি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে নাটকের চর্চা দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। সদর শহর জঙ্গীপুর - রঘুনাথগঞ্জ থেকে ৪০ মাইল দূরে সেদিনের কাঞ্চনতলা-ধুলিয়ান বর্তমানে ধুলিয়ান অঞ্চলে স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই নাটকাভিনয় হত। আজ থেকে ৬০-৭০ বছর আগে সৌরেন্দ্রমোহন রায়, যিনি রাজাবাবু বলে পরিচিত ছিলেন, তিনি শ্রীভবন নামে একটি মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঞ্চে ‘সীতা’, ‘সরমা’, ‘দুই পুরুষ’, ‘কঙ্কাবতীর ঘাট’ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয় জঙ্গীপুর মহকুমার ছাপঘাটিতে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকীতে বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী এখানে বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে ভৃত্য ঈশানের ভূমিকায় অভিনয় করেন। জঙ্গীপুরে দীর্ঘকাল অভিনয়ের চল ছিল। স্থায়ী কোন মঞ্চ ছিল না। তবে মঞ্চ বেঁধে বহু অভিনয় হয়েছে। ‘কেদার রায়’, ‘সাজাহান’, ‘দুই পুরুষ’, ‘বেজায় রগড়’ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়। টাউন ক্লাবের পরিচালনায় ‘ডাইনোসর’ নাটক উল্লেখের দাবী রাখে। জঙ্গীপুরের তুলনায় রঘুনাথগঞ্জে অপেক্ষাকৃত নতুন শহর। অনুসন্ধানে জানা যায় যে একশ বছর আগেও এখানে বিশেষ করে বালিঘাটা অঞ্চলে জমিদার বা বড়লোকের বাড়ীতে নানা পূজা উপলক্ষে নাট্যাভিনয় হ'ত। ১৯১৩-১৪ সালে বাজারপাড়ায় ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটক হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯১১ সালে এই নাটকটি লেখেন এবং প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হবার দু'তিন বছরের মধ্যে এই নাটকের অভিনয় এখানে হয়েছিল। তিরিশের দশকে গোপাল নাট্য মন্দির নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থা অনেকগুলি নাটকের অভিনয় করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘বাঙ্গালী’, ‘দুর্গাদাস’, ‘জনা’, ‘চন্দ্রগুপ্ত’, ‘প্রফুল্ল’, ‘দুই পুরুষ’, ‘সিরাজ-উদ্-দৌল্লা’, ‘টিপু সুলতান’, ‘মীরকাশিম’, ‘নন্দকুমার’, ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’, ‘তাইতো’, ‘আলিবাবা’, প্রভৃতি। এরপর নাম করতে হয় সার্বজনীন পূজা কমিটির। এরা প্রতিবছর পূজা উপলক্ষ্যে নাটক পরিবেশন করত। উল্লেখযোগ্য নাটক ‘স্বর্গ হতে বড়’, ‘মহারাজ নন্দকুমার’, ‘বারভূতে’, ‘সিন্ধুগৌরব’ ইত্যাদি। এই সময় ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। সাইকেলের সাহায্যে বাতি জ্বালিয়ে ফোকাশ ফেলা হ'ত। দেশবন্ধু পাঠাগারও অনেক নাটক মঞ্চস্থ করে, তার মধ্যে ‘রামের সুমতি’, ‘এরাও মানুষ’, ‘ক্ষুধা’, ‘বৌদির বিয়ে’, ‘নবজন্ম’, ‘শতাব্দীর স্বপ্ন’ প্রভৃতি। ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে মহিলা চরিত্রে মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে থাকে। পরেশনাথ গ্রন্থাগারের নাট্য প্রচেষ্টার কথাও এই সময় বলতে হয়। এদের অভিনীত নাটক ‘সাজাহান’, ‘কালিন্দী’, ‘ময়ূর মহল’, ‘বঙ্গে বর্গী’ প্রভৃতি। পাঠাগারে আরো কয়েকটি নাটক ‘বন্ধু’, ‘রীতিমতো নাটক’, ‘বিশ বছর আগে’। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে এরা রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা ও শোধবোধ নাটকের অভিনয় পরিবেশন করে। ১৯৬১-৬২ সালে এখানে একটি সাংস্কৃতিক কৃষি বিষয়ক প্রদর্শনী করা হয়। রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান, নিমতিতা, কাঞ্চনতলা, এতে অংশ নেয়। অভিনীত হয় ‘দুই পুরুষ’, ‘সীতা’, ‘কঙ্কাবতীর ঘাট’, ‘ষোড়শী’, ছয়ের দশকে প্রখ্যাত নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক হিসাবে এখানে আসেন। তিনি প্রথম ‘সরাইখানায় এক রাত্রি’, নামে একটি অনুবাদ নাটক রচনা করেন এবং কলেজে অভিনয় করান। পরে এই নাটক বহরমপুরে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরষ্কৃত হয়। এই প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জের আর একটি সংস্থা সবুজ সংঘও পুরস্কৃত হয়। পরবর্তী কালে অনামী ও বলাকা নামে দু'টো সংস্থা নাট্য চর্চায় উৎসাহী হয়। এদের পরিবেশিত নাটকগুলি হল ‘এ্যান্টনী ফিরিঙ্গি’, ‘তিন পয়সার পালা’, ‘টিনের তলোয়ার’। ১৯৮৭ তে প্রতিষ্ঠিত নাট্যম বলাকা সংস্থা এখানকার নাট্যচর্চায় বিশেষ অবদান রাখে। এদের প্রযোজিত নাটক ‘দান সাগর’, ‘নৈশ ভোজ’, ‘সুন্দর’, ‘দর্পণে শরৎশশী’, ‘গল্প হেকিম সাহেব’, ‘মুষ্ঠিযোগ’, ‘তৃতীয় নয়ন’, ‘সংকল্প’ ইত্যাদি।

ফরাক্কা ঃ ফরাক্কা বাঁধের দৌলতে এখানে বিশাল জনবসতি গড়ে উঠে। চাকুরীর সূত্রে সারা ভারতের জনগোষ্ঠী এখানে আসে ও বসবাস শুরু করে। এরাই এখানে সংস্কৃতিক চর্চা শুরু করে। ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন সেন্টার (১৯৬৪) ৩২ বছর ধরে নাট্য প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা ছাড়া এদের প্রযোজিত নাটক ‘লৌহকপাট’, ‘দুই মহল’, ‘সেমসাইড’, ‘অন্ধকারের নীচে সূর্য’, ‘সাজানো বাগান’, ‘সত্য মারা গেছে’, ‘শাস্তি’, ‘কালোমাটির কান্না’, প্রভৃতি। অনির্বাণ নাট্য সংস্থা (১৯৭৭) অভিনীত নাটকের মধ্যে আছে ‘অথ স্বর্গ বিচিত্রা’, ‘পঙ্গপাল’, ‘বিনয় বাদল দিনেশ’। সাগ্নিক নাট্য সংস্থা ১৯৭৮ নিবেদিত নাটক ‘অ-এ অজগর আসছে তেড়ে’, ‘চোখে আঙ্গুল দাদা’, ‘তাহার নাম রঞ্জনা’, ‘আমি মদন বলছি’ ইত্যাদি। ফরাক্কা সংস্থা (১৯৮০) প্রযোজিত নাটক ‘আমি মন্ত্রী হব’, ‘পাহাড়ী ফুল’, ‘জীবনরঙ্গ’ ইত্যাদি। সবাক সাংস্কৃতিক সংস্থা (১৯৮৫) পরিবেশন করে ‘গরমভাত’, ‘অমলের স্বপ্ন’, ‘ওস্তাদের কসম’, ‘এ দিন সে দিন’, ‘যোগীরাম কি হাভেলী’ ইত্যাদি। কালচারাল ইউনিট, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন (১৯৮৬) এর উল্লেখযোগ্য নাটক ‘মৃত্যু নেই’, ‘মানুষ শুধু মানুষ’, ‘চলো নিশ্চিন্তপুর’, ‘প্রণামী থালায় দিবেন’, ‘আর এক ঝিন্দের বন্দী’, ‘কিনু কাহারের থেটার’, ‘গল্প হেকিম সাহেব’ ইত্যাদি। সমন্বয় সংস্থা

(১৯৯১) প্রযোজিত নাটক 'অবাক জলপান', 'আলোকবৃত্তে', 'মুকুট', 'গেছোবাবা' ইত্যাদি। ফরাক্কা সংলগ্ন বাহাদুরপুর এর তরুণ সংঘ প্রযোজিত নাটক 'লাল রক্ত', 'কালো হাত', 'তেলেঙ্গানা' 'পরশপাথর', ইত্যাদি। এদের নাটকগুলিতে যাত্রা ও সাঁওতালী সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ভিন্নরীতির নাট্য ক্রিয়া গড়ে উঠে। বেনিয়াগ্রামের শশিভূষণ সিনহা, যিনি শতবর্ষ আগের নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারের একমাত্র সাক্ষী ছিলেন, তাঁরই উদ্যোগে তিনটি নাট্য সংস্থা গড়ে উঠে। ১) অরুণোদয় কালচার (১৯৫৫) —এদের প্রযোজিত নাটকগুলি হল 'সিরাজ-উদ্-দৌল্লা', 'একমুঠো আকাশ', 'ক্লান্ত রূপকার', 'তাহার নামটি রঞ্জনা' ইত্যাদি। ২) বীণাপানি নাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটক 'বঙ্গে বর্গী', 'দানবীর', 'পণমুক্তি', 'রাণী দুর্গাবতী', 'সতীর ঘাট', 'মানুষ', 'সিরাজ-উদ-দৌল্লা' প্রভৃতি। ৩) তরুণ সংঘের প্রযোজনাগুলির মধ্যে ছিল 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'কেদার রায়', 'টিপু সুলতান' ইত্যাদি। সঞ্জীবনী সংঘের নাট্য শাখা মুখ কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল 'নবান্ন', 'ছেঁড়া তাঁর', 'গাব্বু খেলা', 'বায়েন', 'ধর্মযোদ্ধা'।

মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার সেই ঐতিহ্য আজো বর্তমান। জেলার নবীন ও প্রবীন দলগুলো নাটক নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু জেলার মধ্যে জেলার বাইরেও এই সব নাট্যদল বা তাদের প্রযোজিত নাটকের বিশেষ সুনাম আছে।

ভাস্কর্য ও শিল্পকলা

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যঃ অতি প্রাচীনকালে মুর্শিদাবাদে শিল্পকলার চর্চা কেমন ছিল তাস্পষ্ট ভাবে জানার উপায় নাই। ফরাক্কায় আবিষ্কৃত অন্যান্য নিদর্শনের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি পোড়ামাটির অতিসুন্দর মাতৃকা মূর্তিপাওয়া গিয়েছে। ঐতিহাসিক কালেরও অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে। তাতে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অতীতের শিল্পকলা বিষয়ে মোটামুটি ধারণা করা যায়।

কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে একটি বিশাল ত্রিরথ পঞ্চায়তন মন্দিরের ভিত্তিসহ বেশ কিছু অংশ পাওয়া গিয়েছে। মন্দিরটির দেওয়ালে যে কুলঙ্গীগুলি আছে তাতে পোড়ামাটির মূর্তি ছিল বলে জানা যায়। এখঅনে পোড়ামাটির অলঙ্করণ সমৃদ্ধ বেশ কিছু মূর্তি ও পশুপক্ষীর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মহীপালে পাল আমলের বহু নিদর্শন এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। সুন্দর কারুকার্য করা পাথরের স্তম্ভ ও মূর্তি সেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায়। জীয়ৎকুঁড়ি, ইন্দ্রাণী, কান্দী থানার নবগ্রাম, সালার প্রভৃতি স্থানে পাথরের মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মন্দিরের দেওয়াল ও স্তম্ভে চমৎকার ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখা যায়।

মোগল- পূর্ব যুগের ইসলামী স্থাপত্যের কিছু নিদর্শন সেই আমলে নির্মিত ধ্বংসপ্রায় বা ধ্বংসস্তূপে পরিণত কয়েকটি মসজিদে দেখতে পাওয়া যায়। আগাগোড়া অতি উচ্চ শ্রেণীর পোড়া মাটির অলঙ্করণে সমৃদ্ধ খেরুরের চমৎকার মসজিদ, ব্রাহ্মণী গ্রামের মসজিদের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত অলঙ্কৃত ইঁট, গিয়াসাবাদের দরগায় পাথরের উপর অসাধারণ সূক্ষ্ম কারুকর্ম, বহরমপুররের কারবালা মসজিদের নিম্ন অংশে পাথরের সূক্ষ্ম কাজ, এই যুগের শিল্প কলার কিছু নিদর্শন। তবে পাথরের উপর কাজগুলি সম্ভবতঃ আরও আগেকার দিনের শিল্পকীর্তি।

মোগল যুগের বহু নিদর্শন জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মসজিদ গাত্রের অলঙ্করণ, মসজিদ এবং বিশেষ করে ঐ যুগে নির্মিত মন্দিরের গায়ে পঙ্কের (অর্থাৎ চুনবালির সূক্ষ্ম কাজ) কাজ, দেওয়াল গাত্রে অঙ্কিত চিত্র সুষমা সে যুগের শিল্পকলার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। গোকর্ণ, পাঁচথুপি ও জজানের মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্করণ মধ্যযুগের প্রথম দিকের শিল্পকলার উদাহরণ। বড়নগরের মন্দিরগুলির অতি উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির অলঙ্করণ এবং কিছু পঙ্কের কাজ অতীব সুন্দর। ভট্টমাটির মন্দির গাত্রে সর্বত্র অতি উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য দেখার মত। মুর্শিদাবাদের প্রধানতম দর্শনীয় হর্ম্য 'হাজারদুয়ারী' প্রাসাদের দরবার গৃহটিতে অতি রমণীয় পঙ্কের কাজ আছে। কাঠগোলায় আদিনাথের মন্দির এবং কাশিমবাজারের বড় রাজবাড়ীর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পঙ্কের কাজ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ঐ মন্দিরের কাঠের দরজায় বা পাঁচথুপির সিংহবাহিনী মন্দিরের দরজায় কাঠের কাজ অতি মনোহর! কেল্লা নিজামতের দক্ষিণ দরওয়াজার সন্নিকটে দারাব আলি খাঁ'র এস্টেটের ছোট ইমামবাড়াটির অভ্যন্তরেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পঙ্ক ও দারুশিল্পের নিদর্শন আছে।

আধুনিক কালের পঙ্কশিল্পী রাখাল মিস্ত্রী তাঁর শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন বহরমপুরের নতুন বাজার এলাকায় শ্যামসুন্দরের মন্দির গাত্রে। প্রয়াত রাখাল মিস্ত্রী বিগত শতাব্দীর (বিংশ) লোক এবং বহরমপুর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সামনের পঙ্খের কাজও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

মূর্তি শিল্পঃ প্রাচীনকালের মুর্শিদাবাদের শিল্পকলার অধিকাংশ নিদর্শনই অবশ্য মন্দির গাত্রের চিত্র বা অলঙ্করণ এবং মূর্তি শিল্প। পাল-সেন যুগের অজস্র মূর্তি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। সেগুলির মধ্যে কান্দী থানার নবগ্রামের (কান্দী থানা) কাত্যায়ণী, গোকর্ণের নরসিংহ, গোলাহাটের মহাসরস্বতী, যশোহরির 'মহারুদ্রদেব' জজানের মনসা, কান্দী থানার বাটীতে অর্ধনারীশ্বর প্রভৃতি মূর্তিগুলির শিল্প সুষমা অপরূপ। রাঙামাটিতে প্রাপ্ত অষ্টম শতাব্দীর মহিষমর্দিনী, কিম্বা গুপ্ত আমলের Stucco বা চুনবালি নির্মিত মনুষ্য মুখটির শিল্পকর্মও উচ্চ শ্রেণীর। গিয়াসাবাদে প্রাপ্ত

এবং সাধকবাগে রক্ষিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি বা মহীপাল অঞ্চলে ষষ্ঠী তলায় (হুকার হাট) পূজিত পদ্মপানি বোধিসত্ত্ব, জীয়ৎকুঁড়িতে (নিমতিতার সন্নিকটে) পাথরের মন্দির গাত্রের ধ্বংশাবশেষে খোদিত পদ্মপানি বোধিসত্ত্ব অথবা বেলডাঙ্গার নিকটে ডুমনী তলার মহাশ্রী তারার শিল্পরূপ অসাধারণ। কান্দী থানা প্রাঙ্গণে নটরাজরূপে পূজিত বৈরোচন বুদ্ধের মূর্তিও কম আকর্ষণীয় নয়।

চিত্রকলা ঃ মোগলযুগের চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে কিরীটেশ্বরীর মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে এবং ভৈরব মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভৈরব মন্দির সম্প্রতি ধ্বংস প্রাপ্ত এবং উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে অতি সম্প্রতি মূল মন্দিরের অমূল্য চিত্রও অবলুপ্ত। মন্দিরটিও বর্তমানে পরিত্যক্ত। তবে কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে রক্ষিত মধ্যযুগে অঙ্কিত সপারিষদ চৈতন্যদেবের চিত্রটির অঙ্কন চাতুর্য ও শিল্পমাধুর্য অতুলনীয়। চিত্রটি মোগল যুগের শেষ দিকের চিত্রকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই অমূল্য চিত্রটি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাজন রাধামোহন ঠাকুর শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার আধুনিক কালের কয়েকজন চিত্রশিল্পীর উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। এ কালের শিল্পীদের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও ইন্দ্রদুগার কেবল দেশের মধ্যেই নয়, দেশের বাইরেও আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। নিমতিতার কছে জগতাই গ্রামে ১৮৯১ সালের ৩০ শে জুলাই ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী কিশোর ক্ষিতীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভার স্ফুরণ দেখে ১৯০৭ সালে তাঁকে গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন। অবনীন্দ্রনাথ তখন ইন্ডিয়ান পেন্টিং বিভাগের অধ্যাপক। ক্ষিতীন্দ্রনাথ কত বড় শিল্পী ছিলেন তা তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্যেই পরিষ্কার ঃ 'আমার দুটি হাতের একটি নন্দলাল, অপরটি ক্ষিতীন্দ্রনাথ.... আমাদের মধ্যে তিনজন তিন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেছি। নন্দলাল শিবসিদ্ধ, আমি নিজে মোগল বিষয়ে সিদ্ধ আর ক্ষিতিন চৈতন্যসিদ্ধ।.... সুক্ষ্ম রেখারচনা ও সুকুমার বর্ণবিন্যাসে ক্ষিতিন আমাকে পরাস্ত করেছে।

রেখার প্রবহমানতা, নমনীয়তা, মোলায়েম বর্ণবিন্যাস, ক্ষীণ রমণীতনু আর তার কান্তিময় দেহলাবণ্য, বাংলার প্রকৃতি ও গৃহাঙ্গণ দর্শককে এক অনুভূতি-নিবিড় স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। ছাত্রজীবনের পর তিনি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন, পরে অধ্যক্ষ হন। ১৯৪২ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং অধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৬৪ সালে অবসর নেন। ১৯৭৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি এলাহাবাদে মারা যান।

ক্ষিতীন্দ্রনাথের পর আরেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর ইন্দ্রদুগার ১৯১৮ সালে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হীরাচাঁদ দুগারও ছিলেন মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার খ্যাতনামা শিল্পী। শান্তিনিকেতন কলাভবনে প্রথম পাঁচজন ছাত্রের তিনি একজন এবং নন্দলালের প্রিয় ছাত্রদেরও একজন। মিনিয়েচার পেন্টিং এ তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখান। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি হ'ল 'তীর্থযাত্রীদের আস্তানা'। তাঁর কাছেই ইন্দ্র দুগারের শিল্পচর্চার হাতেখড়ি। যদিও পরবর্তীকালে তিনি আচার্য নন্দলালের কাছে বেশ কিছুদিন চিত্রশিক্ষার পাঠ নেন। পিতার মাধ্যমে তাঁর পরিচয় ঘটে প্রখ্যাত শিল্পী রমেন চক্রবর্তীর সঙ্গে। রমেন চক্রবর্তী তাঁর 'পঞ্চম পাহাড়' ছবিটি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে আলোচনা করে প্যারিসের চিত্র প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দেন। ইন্দ্র দুগারের চিত্র প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়েছে আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানীর বিভিন্ন জায়গায়, যা তাঁকে আন্তর্জাতিক মানের শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাজপুত রমণী, ভীল নারী, জিয়াগঞ্জ ও বারাণসীর ঘাটের দৃশ্য, সাঁওতাল প্রণয়িনী ও রাজগীরের নিসর্গ চিত্র তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্ররচনা।

মুর্শিদাদের আরেক বিখ্যাত শিল্পী হলেন বহরমপুরের মণি রায়চৌধুরী। তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। ছাত্রজীবনের পর তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কাটে প্যারিসের শিল্প পরিবেশে। শেষ জীবনে তিনি বহরমপুরের বাড়িতে কাটান। তিনি ছিলেন গোয়ালিয়র স্টেটের স্টেট আর্টিস্ট। তাঁর 'ভেল অব ডেথ' এবং 'অশোকের শেষ জীবন' খুবই বিখ্যাত ছবি। বহরমপুরের থাকাকালীন তিনি 'শিল্পের গল্প' নামে শিল্প সম্পর্ক একটি বিখ্যাত বই লেখেন ।

প্রখ্যাত সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীও প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। তাঁর আঁকা বেশ কিছু ছবি কাশিমবাজারের ছোট রাজ বাড়িতে রক্ষিত আছে। এছাড়া মুর্শিদাবাদের অন্যান্য খ্যাতিমান শিল্পীদের উল্লেখয়োগ্য হলেন বেলডাঙ্গার হরেকৃষ্ণ সাহা, জিয়াগঞ্জের মণি তিওয়ারি, বানজেটিয়ার প্রফুল্ল নন্দী, কাশিমবাজারের সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বহরমপুরের ব্রজেন পাল, দুর্গা বন্দোপাধ্যায়, বি. মল্লিক, গোবিন্দ দাস, যামিনী পাল, জ্ঞানব্রত ঘোষাল, তুতু রাহা, রাজবল্লভ ধর প্রমুখ।

মুর্শিদাবাদ কলম

মোগল চিত্রকলা তার নিজস্ব চরিত্রগুণ আর বিশিষ্টতাগুলি অর্জন করে সম্রাট আকবরের শাসন কালে (১৫৫৬-১৬০৫) তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালই হ'ল মোগল চিত্র কলার সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় যুগ। জাহাঙ্গীর ছিলেন আকবরের মতোই চিত্রকলার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। মোগল চিত্রকলা তার নিজস্ব বিশিষ্টতার উজ্জ্বল যে গুণগুলি আকবরের দরবারী শিল্পীদের হাতে অর্জন করে সেগুলি শৈলী ও আঙ্গিকের দিক থেকে আরও পরিণত

ও সুচারু হয়ে ওঠে জাহাঙ্গীরের আমলে। পরবর্তী সম্রাট সাজাহান শিল্পপ্রেমিক হলেও, তাঁর প্রবণতা ছিল প্রধানত স্থাপত্যশিল্পের দিকে- যদিও দরবারের চিত্রকরদের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কোনরকম ঔদাসীন্য ছিল না। সাজাহানের দরবারের চিত্রকরদের কাজে একদিকে যেমন বিষয়বস্তুর বৈচিত্র দেখতে পাওয়া যায়-সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে শিল্পীর ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনিপাওয়া যায় এক মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার পরিচয় - শিল্পীর হাস্যরসোজ্জ্বল এক সরস মানবিক মনের পরিচয়।

মোগল চিত্রকলা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা তার সমৃদ্ধির অবসানের তারিখটিকে চিহ্নিত করেন ঔরঙ্গজেবের শাসন কালের (১৬৫৮-১৭০৭) শুরু থেকে। চারুকলার প্রতি নিতান্তই অননুরক্ত, অত্যন্ত গোঁড়া রক্ষণশীল প্রকৃতির ঔরঙ্গজেব তাঁর দরবারের শিল্পীদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বাস্তবিক পক্ষে তিনি চিত্রচর্চার ওপরে একরকম নিষেধাজ্ঞাই জারি করেছিলেন বলা যায়।

এর ফলে, তাঁর দরবারের চিত্রকররা অন্যান্য সামন্ত রাজাদের আর আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার সন্ধানে রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। এঁদের একটা বড়ো অংশ রাজস্থানের নানা রাজ্যের দরবারে সসম্মানে গৃহীত হন। অনেকে সাদর আশ্রয় পান হিমাচল প্রদেশের কয়েকটি রাজ্যে এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে কয়েকজন সামন্ত ভূস্বামীর দরবারে। ফলে, রাজস্থানী ও উত্তর ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্র অনুযায়ী বিভিন্ন 'স্কুল' বা কলমের বিকাশ ঘটে(যেমন কাংড়া কলম, বাশোলী কলম, জয়পুরী কলম, লাহোর কলম, ইত্যাদি। সংগীতে যেমন 'ঘরানা' চিত্রকলায় তেমনি 'কলম'। মোগল দরবারে ভূতপূর্ব শিল্পীদের প্রেরণায় স্থানীয় শৈলী ও রীতিপদ্ধতির সমন্বয়ে এক-একটি কলম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় চিত্রকলার ভাণ্ডারে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব দান রাখে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় চিত্রকলার এই সব বিভিন্ন 'স্কুল' বা কলমের প্রায় প্রত্যেকটি নিয়েই এ পর্যন্ত মোটের ওপর বেশ বিস্তারিত অলোচনা হলেও, কয়েকটি কলম এখনও পর্যন্ত অনালোচিত ও প্রায় অজ্ঞাত থেকে গেছে বলা যায়। এই ধরণের একটি অজ্ঞাত কলম হল মুর্শিদাবাদী কলম। এই মুর্শিদাবাদ-কলমের ঐশ্বর্য ও মুন্সিয়ানা অন্যান্য উত্তর-ভারতীয় কলমগুলির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। স্থানীয় রীতি পদ্ধতি ও চিত্র-চরিত্রের সমন্বয়ে অন্যান্য কলমগুলি যেমন নিজ নিজ বিশিষ্টতা ও মৌলিক গুণ অর্জন করেছিল, তেমনি এই মুর্শিদাবাদী কলমও বাংলাদেশের মাটিতে শেকড় চালিয়ে প্রধানত স্থানীয় লোকশিল্পের উৎস থেকে প্রাণরস আহরণ করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল।

তা সত্বেও, উত্তর-ভারতীয় চিত্রকলার বিভিন্ন কলমের তুলনায়-বিশেষত কাংড়া, বাশোলী ও অন্যান্য রাজস্থানী কলমের তুলনায় এই মুর্শিদাবাদ কলম সম্বন্ধে যে প্রায় কোন আলোচনা অনুশীলন হয়নি, তার কারণ-এই কলমে রচিত চিত্রসম্ভার মুর্শিদাবাদের নবাব-প্রাসাদে বা এই জেলার অন্যান্য সংগ্রহকেন্দ্রে খুব কমই আছে। এত কম আছে যে সেগুলি বিশেষভাবে চিত্ররসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। মুর্শিদাবাদ-কলমে আঁকা অধিকাংশ ছবিই ব্রিটিশ শাসন কায়েম হবার পর প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই - ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় সংগ্রহকারীরা নিজের নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেন। ফলে, মুর্শিদাবাদ নবাব প্রাসাদে গিয়ে খুব সন্ধানী চোখ নিয়েও এই কলমে আঁকা দু-চারটির বেশী ছবি চোখে পড়েনা - অন্তত সর্বসাধারণের দ্রষ্টব্য হিসেবে যেসব ছবি সেখানে রয়েছে সেগুলির মধ্যে। নবাব-পরিবারের ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেগুলির দিকে চিত্ররসিক ও চিত্র ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

এই মুর্শিদাবাদ-কলমে আঁকা ছবির একটি খুব ভালো সংগ্রহ আছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে। মিউজিয়মের একটি বুলেটিনে এই মুর্শিদাবাদ কলমের কতকগুলি ছবি একটি ছোট ভূমিকাসহ মুদ্রিত হয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁর দরবারের যে সব শিল্পী অন্যান্য রাজন্যবর্গের আশ্রয়ের সন্ধানে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের একটি দল মুর্শিদাবাদের নবাবের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার আশায় সুদূর বাংলা দেশে চলে আসেন।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ প্রাদেশিক দেওয়ানের পদ থেকে পুরোপুরি সুবাদারের পদে উন্নীত হন এবং মোগল দরবারের উদ্বাস্তু শিল্পীদের এই দলটি প্রায় সেই সময়েই মুর্শিদাবাদে এসে তাঁদের নতুন ঘর বাঁধেন। মুর্শিদকুলি খাঁ ব্যক্তিগতভাবে খুব চিত্রকলারসিক না হলেও, নানা ধরনের ধর্মীয় ও দরবারী উৎসব অনুষ্ঠানে সাজসজ্জা-অলংকরণ - ইত্যাদির জন্য তাঁর শিল্পীর প্রয়োজন ছিল। গোড়ার দিকে তিনি এই শিল্পীদের প্রধানত সেই কাজেই লাগান। তাঁদের কাজ সর্বসাধারণের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করায়, মুর্শিদকুলি খাঁ পরে তাঁদের স্বাধীনভাবে চিত্রাঙ্কনের কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করতে উৎসাহিত হন।

১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আঁকা এই রকম একটি ছবিতে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদের এক প্রশস্ত চাতালে মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারের দৃশ্য চিত্রিতঃ মসনদে বসে আছেন মুর্শিদকুলি, পাশে তাঁর বালক-পৌত্র সরফরাজ খাঁ, সমনে দণ্ডায়মান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আলীবর্দী খাঁকে দেখা যায়(ভাগীরথীর বুকে আলোকমালায় সজ্জিত অনেকগুলি বজরা ও নৌকা, তুবড়ী হাউই ইত্যাদি অতসবাজী জ্বলছে। কোন একটি উৎসবের দিনের (বেরাভাসানের) দৃশ্য। অঙ্কন-শৈল্পীর

দিক থেকে-ফিগারগুলির সংস্থান, অপেক্ষাকৃত ঘন ও অনুজ্জ্বল রঙ তার রেখার সুচারুতার সমন্বয়ে - এই ছবিটি ঔরঙ্গজেবের সময়কার মোগল দরবারের শিল্পীদের কাজের সর্বাংশে অনুরূপ। মুর্শিদাবাদ-কলমের ছবির প্রথম ও প্রতিনিধিস্থানীয় একটি নিদর্শন এই রচনাটি।

এর পরে মুর্শিদাবাদ কলমের ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও সমৃদ্ধির নিদর্শন পাওয়া যায় ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দী খাঁর মসনদে বসার সময় থেকে। তাঁর জীবনের এই শেষ কয়েক বছরের খুঁটিনাটি বর্ণনা রেখে গেছেন গোলাম হোসেন খাঁ। তিনি বলেছেন - আলীবর্দী নৃত্যগীত ও নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন না। কিন্তু কারু ও কারুকলা, কাব্য-সাহিত্য, শিকার, ক্রীড়া, বিজ্ঞান-চর্চা ইত্যাদির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। দরবারের চিত্রকরদের প্রতি ছিল তাঁর উদার দাক্ষিণ্য।

আলীবর্দীর আমলে আঁকা ছবিগুলিতে শিল্পীর কলমে সঞ্চারিত হয়েছে এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্ব। অধিকাংশ ছবিরই বিষয়বস্তু অ্যাক্শনবহুল(শৈলী বেশ একটু বিধিবদ্ধ ও ফর্ম্যাল(বুনোটের মধ্যে এক ধরণের ঘনসংবদ্ধতা। এবং সবচেয়ে যেটা লক্ষণীয়, সেটা হ'ল-ফিগারগুলির সঙ্গে দৃশ্যপটভূমির ভাবকল্পনার বৈসাদৃশ্য। ফিগারগুলি যেমন সাবলীল, বাস্তবানুগ আর সক্রিয় এক স্বাচ্ছন্দ্যে গতিবহুল, ল্যাণ্ডস্কেপগুলি ঠিক তেমনি অবাস্তব ষ্টাইলাইজড্ ও কিছুটা বিমূর্ত। এদিক থেকেই, এই সময়ের মুর্শিদাবাদ কলমে বাংলা দেশের লোকশিল্পের প্রভাব লক্ষণীয়। ইতিমধ্যে এই দরবারী শিল্পীদের কলমে স্থানীয় লোকশিল্পীদের ওই বৈশিষ্ট্যগুলি সঞ্চারিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

এই সময়কার যে ছবিগুলি পাওয়া যায়, তার অনেকগুলি হ'ল আলীবর্দী খাঁর দরবারের দৃশ্য আর কিছু রাগমালা চিত্রাবলী। দরবারে বা প্রাসাদ-চাতালে আসীন আলীবর্দী খাঁর ছবিগুলির মধ্যে একটিতে তাঁর চারিপাশে আরও অনেকের মধ্যে তরুণ সিরাজ-উদ্-দৌল্লাকে দেখা যায়। ছবিটির নক্শা ও বিন্যাস পুরোপুরি জ্যামিতিক, বিভিন্ন রঙ আগাগোড়াই প্রায় সমান ঘন, কিন্তু রেখার অসাধারণ চারুতায় ছবিটিতে এক অপূর্ব মুন্সিয়ানার পরিচয় ফুটেছে।

রাগমালা - চিত্রাবলীর প্রায় প্রত্যেকটিই রেখা ও রঙের চারুতায় আর ভাবকল্পনার দিক থেকে অপূর্ব। গোলাম হোসেন খাঁর বিবরণ থেকে মনে হয় এই রাগমালা চিত্রাবলী আলীবর্দীর আমলে আঁকা শুরু হয়ে থাকলেও, বেশীর ভাগই সিরাজ-উদ্-দৌল্লার নির্দেশে ও উৎসাহে অঙ্কিত। কারণ, প্রায় প্রত্যেকটি রাগরূপের চিত্রেই সিরাজ-উদ্-দৌল্লা নায়ক হিসেবে চিত্রিত। নায়িকাদের লাবণ্যভরা দেহভঙ্গিমায় ও মুখের ভাবে সুন্দর এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদন আছে। অঙ্কন রীতিমতো বাস্তবানুগ।

মুর্শিদাবাদের এই রাগমালা ও নায়িকা - প্রকরণ চিত্রাবলীর সঙ্গে অনুরূপ বিষয়ে আঁকা রাজস্থানী চিত্রাবলীর সাদৃশ্য যেমন লক্ষণীয় তেমনি ভিন্নতাটুকুও লক্ষ্য না করে পারা যায় না। তফাৎটুকু প্রধানত শিল্পীর মেজাজের দিকে থেকে, রাজস্থানের বিভিন্ন কলমে আঁকা নায়িকা ও রাগমালা চিত্রাবলীতেও শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক রাজন্য-ভূস্বামী নায়ক রূপে চিত্রিত, কিন্তু সাধারণভাবে সেখানে রীতির প্রাধান্য, বিষয়বস্তুর রোমান্টিকতা শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করলেও, তাঁর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীটা মোটামুটি ফর্মাল। মুর্শিদাবাদী কলমে আঁকা নায়িকা ও রাগমালা চিত্রগুলিতে শিল্পীর মনোভাবটা অন্তরঙ্গ, মেজাজটা ঢের বেশী ঘরোয়া ও ব্যক্তিগত, ভাবকল্পনাটি পুরোপুরি সুরেলা ও লিরিক্যাল। সব মিলিয়ে অপূর্ব এক মাধুর্যরসে সিঞ্চিত। লোকশিল্প থেকে আহৃত এই বৈশিষ্ট্যটি প্রায় গোড়া থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে।

দরবারী জীবনই ছিল মুর্শিদাবাদের কলমে আঁকা ছবির প্রধান উপজীব্য। সেই সঙ্গে কিছু খানদানী ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি, নায়িকা-প্রকরণ আর রাগমালা চিত্র এই শিল্পীরা এঁকেছিলেন। বিভিন্ন রাজস্থানী কলমে আঁকা ছবিগুলিতে - এমন কি, তার পূর্ববর্তী মোগল চিত্রকলাতেও - যেমন দরবার-জীবনের সঙ্গে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনও বেশ ব্যাপকভাবে রূপায়িত, মুর্শিদাবাদী চিত্রকলায় তা নয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিল্পীর খুব একটা স্বাধীনতা ছিল না বলে মনে হয়। স্বাধীনভাবে, নিদের খুশিমতো ছবি আঁকার সময়ে, জনসাধারণের দৈনন্দিন কর্মজীবনকে শিল্পী নিশ্চয় চিত্রিত করেছেন। কোনো শিল্পীই তা না করে পারেন না। কিন্তু সে সব ছবি সরকারী তসবীরখানায় কিংবা পৃষ্ঠপোষকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্থান পায়নি(শিল্পীর বা তঁর উত্তরাধিকারীদের ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবেই কালক্রমে সেগুলির বিলুপ্তি ঘটেছে।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মীরকাশিম-এর পরাজয় ও পলায়নের পরে এবং বৃদ্ধ রোগগ্রস্ত মীরজাফরের মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকে, মুর্শিদাবাদ দরবারে চিত্রচর্চা দ্রুত ক্ষয়ের দিকে যেতে থাকে। মীরজাফর বা তাঁর ক্রীড়নক উত্তরাধিকারীদের এমন অর্থ সামর্থ ছিল না যাতে তাঁরা দরবারে নিয়মিত শিল্পী রাখতে পারেন অথবা নিয়মিতভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারেন। ফলে, মুর্শিদাবাদ কলমের অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং দুর্দশাগ্রস্ত শিল্পীরা হয় আশেপাশের হিন্দু জমিদারদের আর না হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

বলা দরকার, মোগল দরবারের শিল্পীদের মধ্যে যেমন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন (শেষের দিকে হিন্দু শিল্পীদের সংখ্যাই ছিল বেশি), তেমনি মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারেও হিন্দু ও মুসলমান শিল্পীরা নবাবদের সমান পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করতেন। মুর্শিদাবাদ দরবারের এই সব শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি

অর্জন করেছিলেন আলীবর্দী ও সিরাজ-উদ্-দৌল্লার দরবারের দীপ চাঁদ এবং মীরকাশিমের দরবারের (১৭৬০-৬৩) পূরণ নাথ (যিনি সম্ভবত লক্ষ্মৌ থেকে এসে মীরজাফরের প্রথমবার মসনদে বসার সময়ে দরবারী শিল্পীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক আর উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে এই শিল্পীরা, তাঁদের পৃষপোষকদের রুচিবদল-জনিত নতুন চাহিদা অনুযায়ী ইউরোপীয় জল রঙের নকল করতে শুরু করেন। কলকাতা তখন ইউরোপীয় সংস্কৃতি অনুশীলনের ও অনুকরণের এক দ্রুত ক্রমবর্ধমান কেন্দ্র। ভিক্টোরীয় চারুকলা ও স্থাপত্যের মান অনুযায়ী তখন উঠতি বাঙালী ধনিক শ্রেণীর রুচি ও মন তৈরী হচ্ছে। তাই শিল্পীরাও ইউরোপীয় চিত্রকলার নকলনবিশী ধরলেন। মুর্শিদাবাদের দরবারী চিত্রকলার দিন শেষ হ'ল। মুর্শিদাবাদ নবাব প্রাসাদে আজ গেলে চিত্রকলা বলতে চোখে পড়বে নবাব-নাজিমদের আর তাঁদের বংশধরদের বড়ো বড়ো অয়েলপেন্টিং প্রতিকৃতি যার অধিকাংশই কোম্পানীর আমলে ভাগ্যান্বেষণে ভারতাগত ইংরেজ চিত্রকরদের আঁকা আর কিছু তাঁদের কাছে 'শিক্ষাপ্রাপ্ত' বা তাঁদের অনুকারী 'নেটিভ' চিত্রকরদের আঁকা।

লোকসংস্কৃতি

প্রবেশিকা পর্ব ঃ

মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার বর্তমান সীমানাভুক্ত এলাকার লোকসমাজের সংস্কৃতি। সাধারণ ভাবে বলা চলে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ - শিক্ষা - সংস্কৃতির বাইরের যে জনসাধারণ তারাই লোকসমাজ। ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরের যে আপামর জনসাধারণ, যার অধিকাংশ গ্রামবাসী ও কৃষিজীবি এরাই এ জেলার লোকসমাজ। এদেরই সংস্কৃতি এ জেলার লোক সংস্কৃতি। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব যেমন লোকসমাজে পড়েছে, তেমনি পড়েছে লৌকিক সংস্কৃতিতেও। কারণ লোকসমাজও এইসব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। অপরপক্ষে লোকসমাজে প্রচলিত হাজার হাজার বছরের সমান্তরাল যে ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, চিন্তা-ভাবনা, আচার, অনুষ্ঠান পুরুষানুক্রমে বাহিত হয়ে চলেছে, লোকসংস্কৃতির ভিত্তি কিন্তু সেখানেই প্রোথিত। অর্থাৎ আজকের লোকসংস্কৃতি প্রবহমান লোকায়তিক ধারার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ধারার মিশ্রণে গঠিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির আলোচনায় ভৌগোলিক এলাকার প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদী-নালা, খাল-বিল, চাষ-বাস, জীবিকা, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজ, ধর্ম রাজনীতি সব কিছুই একান্ত প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক জনবসতি ও জনবিন্যাসের বিবর্তন এবং ধর্মীয় উত্থানপতনের ধারাবাহিকতা।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঃ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত ভাগীরথী নদী এ জেলাকে মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। এই বিভাজন ভৌগোলিক বিভাজন শুধু নয়, লৌকিক সংস্কৃতির বিভাজনেও এর গুরুত্ব কম নয়। পশ্চিম প্রান্ত রাঢ় নামে খ্যাত। এই অঞ্চলটি অত্যন্ত প্রাচীন। ভাগীরথীর পূর্ব প্রান্ত যাকে আমরা বাগড়ী বলি সেটি অর্বাচীন জনপদ হিসাবে গড়ে উঠেছে।

ফরাক্কার কাছে প্রাচীন গুমানি নদীর তীরবর্তী স্থানে প্রিস্তর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু উপযুক্ত খনন কার্য না হওয়ায় সেই ইতিহাস আজও মাটি চাপা পড়ে আছে। সেই সুপ্রাচীন শুঙ্গ আমলের নিদর্শনগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এ জেলার লৌকিক সংস্কৃতির গভীর গোপনে তার যে কোন স্মারক লুকিয়ে নেই কে বলতে পারে?

হুসেন শাহের আমলে মুর্শিদাবাদের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত বাদশাহী সড়কটি বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সড়কের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। 'ডাক অন্তর মসজিদ আর ক্রোশ অন্তর দীঘি'র কত কিংবদন্তি এই রাস্তার দু-প্রান্তে আজও ছড়িয়ে আছে। সেখানে নৌ-বাণিজ্য ও যাতায়াত ব্যবস্থা নদী নির্ভর ছিল। ভগবানগোলা, লালগোলা, ঘাটবন্দর, বন্দর কাশিমবাজার, আজিমগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি স্থানগুলি প্রাচীন নৌ-বাণিজ্য ও ব্যবসার কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংস্কৃতির নানা উপকরণে এ সবের স্মৃতি পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে এ জেলার অনেক স্থানের নাম পাওয়া যায়। পাটন বিল, বসিয়ার বিলে যে নৌ-বাণিজ্য হত সে কথা আমরা পাচ্ছি মনসামঙ্গল কাব্যে —

'নবদুর্গা গোলাহাট বামেতে রাখিয়া
চলিল সাধুর ডিঙ্গা পাটন বাহিয়া'

নবদুর্গা গোলাহাটে লৌকিক দেবী জয়মঙ্গল-চণ্ডী হিসাবে পূজিত হচ্ছেন বৌদ্ধ মহাসরস্বতী দেবী। এ সম্পর্কে আমরা পাচ্ছি 'তিন্তিরি বৃক্ষের নীচে দেবীর দেউল'। মুর্শিদাবাদে প্রচলিত মেয়েদের ব্রত কথায় ও ব্রতের ছড়ায় এবং মেয়েলি আলপনায় সেকালে এই নৌ-বাণিজ্যের নানান বিষয় পাওয়া যায়।

নদী, জলাশয়, খাল - বিল বিধৌত এই জনপদে সাপের উৎপাত থাকায় সর্পদেবী মনসার স্থান, পূজা, মনসার পাঁচালী গান এবং সর্পবিষ প্রতিষেধক স্নুহি বৃক্ষের পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে মুর্শিদাবাদের সর্বত্র। এই পূজার্চনা ও মনসা গানে লৌকিক রীতি অনুসরণ করা হয়।

গঙ্গা তীরবর্তী কর্ণসুবর্ণের উত্থান ও পতনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের জনজীবন ও জনসংস্কৃতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। কর্ণসুবর্ণ যষ্ঠ ও

সপ্তম শতাব্দীতে, বিশেষত, মহারাজ শশাঙ্কের সময়ে গৌরবের উচ্চস্থানে পৌঁছেছিল। শশাঙ্ক নিজে ছিলেন শৈব। কিন্তু অন্যধর্মীদের প্রতি ছিলেন উদার। তাঁর পূর্বে ও পরে এই অঞ্চলে ব্যাপক বৌদ্ধ প্রভাব ছিল। শশাঙ্কের সময়কাল থেকে শৈব ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এই জেলায় বিপুল। চৈত্রের গাজনে অংশগ্রহণকারী ব্রাত্য হিন্দুরা সকলেই এক গোত্রভুক্ত হয়ে যান। কোন জাতপাত ভেদাভেদ থাকে না। এই জেলায় বহু প্রচলিত গাজন উৎসবে ও পূজা অনুষ্ঠানে বৈদিক রীতিনীতিকে গ্রাহ্য করা হয় না। চৈত্রের গাজন, মুর্শিদাবাদের বৃহত্তম লোক উৎসব, শিবকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে। গাজন উৎসবের আচার অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রাচারের নানা সংমিশ্রণ ঘটেছে। সম্ভবতঃ মহারাজ শশাঙ্ক অনুসৃত শৈবধর্ম এ জেলায় ব্রাত্য হিন্দুদের মধ্যে লৌকিক ধারায় প্রসারিত হয়ে আজও জনসংস্কৃতির ধারাকে প্রবাহিত রেখেছে। একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত, - নবগ্রাম থানায় মাকরী সপ্তমীতে চণ্ডী পূজোর ব্রতানুষ্ঠানে শত শত বছর ধরে একটি লৌকিক পাঁচালীর প্রচলন আছে। সেই পাঁচালীর একটি অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে —

'ডাইনে চন্দ্র বর্ণ বাঁয়ে হনুমান
শীতলা বর্ণ গোঁসাই যায় জল্লীবান'

চন্দ্র বর্ণ অর্থে ইসলাম, হনুমান অর্থে জৈনধর্ম, শীতলা গোঁসাই বৌদ্ধধর্ম-এই তিন ধর্মকে জলতলেই বিসর্জন দিয়ে সেদিনের উপাসকেরা তাদের সেই প্রহরটি শিবকে দান করলেন। শশাঙ্কের রাজত্বকালে মাকরী সপ্তমীর সূচনা হওয়ায় শশাঙ্কের স্মৃতি এই ছড়ায় বাহিত হয়ে আসছে এটা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে।

কর্ণসুবর্ণের অপর পাড়ে বেলডাঙ্গার দিকে একটি লৌকিক ছড়া ও ব্রতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যা এ জেলা ছাড়া অন্যত্র বিরল। ব্রতের নাম মেলিনীমাসীর ব্রত। এটা কর্ণসুবর্ণ রাজবাড়ীর মালিনীদের নিয়ে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এখানে অনেক শাসকগোষ্ঠীর শাসন কায়েম হয়েছিল। এই সব শাসক শক্তির উত্থানপতনের ইতিহাসের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ও লোকসমাজের নানা কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে। গিয়াসাবাদ, মহীপাল ও পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ নগরী রাজশক্তির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। 'ধান ভাঙতে মহীপালের গীত' এই প্রবাদটি লোকমুখে আজও প্রচলিত আছে। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজশক্তির অনেক সংঘাতের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। জঙ্গীপুরের গিরিয়ার যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ, খড়গ্রামের আতাইয়ের যুদ্ধ, বড়ঞা থানায় মুণ্ডমালার যুদ্ধ, বহরমপুরের দক্ষিণ প্রান্তে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে যুদ্ধ, ইংরেজ আমলে সাঁওতাল বিদ্রোহের ক্ষেত্রভূমি হিসাবে জঙ্গীপুর অঞ্চল এবং সিপাহী বিদ্রোহের উৎসস্থল হিসাবে বহরমপুর ব্যারাকের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত নানা লোক কাহিনী ও ছড়ার মাধ্যমে এ সব ঘটনার অনেক স্মৃতি আজও জনজীবনে প্রবাহিত হয়ে আছে। তার কিছু নমুনা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

পলাশীর যুদ্ধের গ্রাম্যগীত

(নিখিল নাথ রায় সংগৃহীত)

কি হলোরে জান -
পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরান
নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতি
কলকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী
কি হলোরে জান ....
মীরজাফরের দাগাবাজী নবাব বুঝতে পাল্লো মনে
সৈন্য সমেত মারা গেল পলাশী ময়দানে ....।।

আবার বর্গীর হাঙ্গামার সময় প্রচলিত ছড়াটি ছেলে ভোলানো ছড়া হিসাবে আজও প্রচলিত আছে।

'আইরে ঘুম যাইরে ঘুম বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে
ধান ফুরালো পান ফুরালো এখন উপায় কি
আর কটা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি'।

লোকায়ত ধর্ম ঃ অধুনা বড়ঞা থানার ও সংলগ্ন অঞ্চলে আকবরের সময়ে ফতেহাড়ি নামে একজন নিষাদ জাতির সামন্ত রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নামে এই পরগণার নাম হয়েছিল ফতেসিং পরগণা। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহযোগী সবিতা রায় দীক্ষিত মুণ্ডমালার যুদ্ধে হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করেন এবং তিনি সৈন্য সামন্ত সহ এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গে রাজস্থান থেকে আগত ভিল ও ভল্লধারী যোদ্ধবৃন্দ এখানে থেকে যায়। পরবর্তী সময়ে এই যোদ্ধ সম্প্রদায় এই অঞ্চলে সুবিখ্যাত রাইবেঁশে লোকনৃত্যের উদ্ভাবন করেন। এই নৃত্যধারার সূচনা পর্বকে চিহ্নিত করতে আমাদের হাড়ি রাজার কথা বলতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নিষাদরাজের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। গোধিকাসনা চণ্ডীমূর্তির কথা বলা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত অনেক স্থানের নাম বড়ঞা থানা অঞ্চলে এখনো বর্তমান আছে এবং এই থানার অন্তর্গত অধুনা ববরপুর (বীরপুর) গ্রাম থেকে একটি গোধিকাসনা মূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং সেটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায়

রক্ষিত আছে। এই অঞ্চলের মহিলাবৃন্দ জ্যৈষ্ঠ মাসে জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ও উৎসব পালন করে থাকেন। এই জয়মঙ্গল চণ্ডী দেবী কোন বৈদিক দেবী নন। নিষাদ রাজ পূজিত লৌকিক চণ্ডীদেবী।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সবকটি প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রসার ঘটেছে এ জেলায়। এক সময় মুর্শিদাবাদের সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে ছিল বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক ও দীর্ঘ প্রসারী প্রভাব। বাদশাহী আমল থেকে মুর্শিদাবাদে ইসলাম ধর্মের প্রসার হতে শুরু করে। বৌদ্ধধর্মের অন্তিমকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অদূরদর্শিতার কারণে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু সমাজে যথোচিত মর্যাদা না পাওয়ায় কিছু অংশ মুসলিম ধর্মের আশ্রয়ে প্রবেশ করে। ব্রাত্য হিন্দুদের একটি অংশ, যাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদীর কৌলিন্য থেকে দূরে ছিলেন, তারাও ইসলাম ধর্মের তথা তৎকালীন রাজধর্মের উদার ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট হন। এই ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করতে উত্তর ভারত থেকে এ জেলায় অনেক মুসলিম ধর্মপ্রচারক আসেন। তারাও অনেককে ধর্মান্তরিত হতে উদ্বুদ্ধ করেন। বৌদ্ধধর্মের একটি ব্রাত্য অংশ বৌদ্ধ তন্ত্রাচারের সঙ্গে হিন্দু তন্ত্রাচারের সম্মিলন করার সাধনায় মগ্ন হয়ে যান।

অপরপক্ষে নিম্ন বর্গীয় মানুষদের মধ্যে প্রথাগত ধর্মানুশীলনের বাইরে একটি লোকায়তিক ধারার প্রচলন ছিল। এই সকল ব্রাত্য হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সেই ধারা যেমন সজীব ভাবে তাদের জীবনাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল তেমনি বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রাচার, সুফী মতবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়াবাদ, লালন শাহী ধারা এবং কয়েকটি উপধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রভাব এই সকল লৌকিক ধর্মাচারীদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। জন্ম সূত্রে হিন্দু ও মুসলিম এ জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই শেষ পর্যন্ত লোকায়তিক ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসন -বিমুক্ত এক মানবতাবাদী ধর্মের আশ্রয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনা করেন। গাজনের ভক্ত সন্ন্যাসী শৈব যুগী সম্প্রদায়, চিত্রকর সম্প্রদায়, বাউল - ফকির দরবেশ, সাঁই ও সহজিয়া বৈষ্ণবগণ এই সহজ ধর্মের অনুসারী যাঁরা বলেন —

‘যে ভজে মানুষে আল্লা
সেই তো বাউল
বস্তুতে যে ঈশ্বরের খোঁজে সেই তো আউল’।

এ জেলায় অনেক গৃহী বৈষ্ণব ফকির যেমন আছেন তেমনি আখড়াধারী বাউল ফকির দরবেশরাও এ জেলায় ব্যাপক সংখ্যায় ছিলেন এবং আজও এদের সামান্য কিছু অংশের দেখা পাওয়া যায়।

লোক জীবন ঃ মুর্শিদাবাদের লোক জীবনের ও লোক সংস্কৃতির এই বিরাট প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জীবন জীবিকার মূল বিষয়টির কথা সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। লোক সমাজের জীবন ধারণের প্রধান উৎস কৃষিকাজ, মাছধরা, গো-পালন এবং কুটীর শিল্প। তাই এ জেলার ছড়া, লোককথা, লৌকিক চিত্রকলা, ব্রতকথা ও লৌকিক সঙ্গীতে জীবনের এই চলমান ছবি নানান আদলে ভেসে ওঠে।

বহিরাগত জনগোষ্ঠী ঃ মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের দরুণ বাইরের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে এসে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। ফলে এখানকার জনবসতি ও জন সংস্কৃতির ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। সুদূর উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে আগত জীবিকাচ্যুত ও বাস্তুচ্যুত চাঁই, বিন্দ, মুসাহার, গাড়োলি, বিহারী গোয়ালা এবং স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুগণ এ জেলায় এসে থিতু হয়েছেন। কান্দী অঞ্চলে আকবরের সময় থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে আগত পাহাড়ী, রাজস্থানী, আদিবাসী, সৈয়দ, মোগল, পাঠানেরা এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। কখনও কখনও এঁরা নিজেদের দেশজ ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত এঁরা এ জেলার জন অরণ্যে নিজেদের পরিচয় মিশিয়ে ফেলেছেন এবং এ জেলার লৌকিক সংস্কৃতিকে মিশ্র ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে রূপদান করেছেন।

সুফী পীর দরবেশ ফকিরের আস্তানা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণাঞ্চল, রাঢ় ও বাগড়ী সর্বত্র গ্রামাঞ্চলে বাউল - ফকির দরবেশদের আস্তানা বা আখড়াও চোখে পড়বে। এরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সমান্তরালে প্রবাহিত লোক সমাজের লোকায়তিক ধর্মের প্রচারক ছিলেন।

জঙ্গীপুরের ছাপঘাটি, অধুনা হাড়োয়া গ্রামে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির প্রতিভূ মর্তুজানন্দের সমাধি আছে। এখানে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু - মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই উৎসবে অংশ নেন। পাশেই হিলোরা গ্রামে সুবিখ্যাত শ্যামচাঁদের মন্দিরে এক ফকিরের গুদরি (আলখাল্লা) সুদীর্ঘকাল থেকে পূজিত হয়ে আসছে। মুকসুদাবাদ নগরীর নামকরণের সাথে সন্ত মুকসূদন দাস নামে একজন নানকপন্থী সহজিয়া সাধুর যোগসূত্র পাওয়া যায়। তিনিও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাশ্রয়ী ছিলেন না। এনাতুলিবাগে তাঁর সমাধিস্থল। মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে প্রাচীন আখড়া সাধকবাগের আখড়া। এ জেলায় লোকজীবনে আউলিয়া সাধুদের ব্যাপক প্রভাব আছে শত শত বছরব্যাপী। এই আখড়ার সন্তরাম আউলিয়াকে নিয়ে কিংবদন্তীর অন্ত নেই। রেজিনগর রেল স্টেশনের প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে আছে ফরিদ শার আস্তানা। এই আস্তানাতেই পলাশীর যুদ্ধে নিহত মীরমদনের সমাধি আছে। ভগবানগোলা রেল স্টেশনের কাছে দাতা শার আস্তানা। আর জিয়াগঞ্জের কাছে আমাইপাড়াতে আছে অশোক শার আস্তানা, আজিমগঞ্জের সাত মাইল দূরে ঐতিহাসিক গিয়াসাবাদে আছে মহিউদ্দিন শার সমাধি আর টুকরা শার আস্তানা আছে জঙ্গীপুরের সুজাপুর গ্রামে। নিশাতবাগে আছে মসলেম শার আস্তানা। তিনি মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত ‘মলায়েমজাম’

আমটি বাইরে থেকে এনে এখানে রোপন করেন। চোর - ডাকাতের হাত থেকে নিরীহ পথচারীদের তিনি রক্ষা করতেন, আশ্রয় দিতেন। মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের কাছে আছে বাব্বর শার আস্তানা। প্রচলিত আছে তিনি সিংহ ও ব্যাঘ্রীর ঔরসজাত 'বাব্বর' এর পিঠে চেপে হাতে চাবুকের বদলে সাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর মাজারে প্রতি বৎসর শীতকালে হিন্দু-মুসলমান ভক্তবৃন্দ জমায়েত হন। বাব্বর শার আস্তানার পাশেই আছে ঘুঙ্গুর শার আস্তানা। টিকিয়া শার আস্তানা আছে লালবাগের ঐতিহাসিক তোপখানার পাশেই। লালবাগের এলাহিগঞ্জে আছে দরিয়া শার আস্তানা। প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর নামে ভর হয় এবং নানা দূরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ দেওয়া হয় এখান থেকে। মুর্শিদাবাদ শহরের গোলাপবাগে আছে সৈয়দ শার আস্তানা। জেলায় আরো অনেক ফকির দরবেশ, সাধু ও মহন্তদের আস্তানা বা আখড়া ছড়িয়ে আছে। এই সকল ফকির দরবেশবৃন্দ মক্কা, বোখারা, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর ভারত থেকে এসেছিলেন। এঁরা কোরাণ ও মসজিদকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক মুসলিম ধর্মের অনুশাসনে এরা বাধ্য থাকতেন না। এরা লোকায়তিক ধারায় লোকধর্মের প্রচারক ছিলেন। শেরপুর, কুলি, একঘরিয়া, ববরপুর, সালার, কান্দী ইত্যাদি স্থানেও উল্লেখযোগ্য আস্তানা আছে। লালবাগ থানার কুমিরদহ গ্রামে বাস করেন কয়েক ঘর সতীমার অনুসারী সাধক সম্প্রদায়। এরা জন্মসূত্রে মুসলিম। কিন্তু এরা লোকধর্মের অনুসারী। এদের পল্লীতে হরিগাছ (তুলসী) রোপন করা হয়। এরা নিরামিশাষী। এরা সতীমার ভক্ত। হিন্দু গুরুর কাছেও দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনে এরাও দীক্ষা দেন। ভরতপুর থানার আলুগ্রামে হিন্দু পল্লীতে অবস্থিত পীরের আস্তানায় হিন্দু রমণীগণ সন্ধ্যাপ্রদীপ দেন। খড়গ্রাম থানার গুরুলিয়া গ্রামের পীরের আস্তানায় বিজয়া দশমীতে হিন্দুরা সর্বাগ্রে প্রণাম নিবেদন করেন। কান্দীর দক্ষিণাকালি তলায় কিংবা পুরন্দরপুরের মনসাতলায় হিন্দু - মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই মানত দেন এবং নানা রোগের স্বপ্নাদ্য ঔষধ গ্রহণ করেন।

উত্তর থেকে দক্ষিণে ঃ

এখানে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরপ্রান্ত থেকে শুরু করে দক্ষিণের দিকে ধারাবাহিক ভাবে লোকসংস্কৃতির উপকরণের কিছু বিবরণী পরিবেশিত। এ আলোচনায় ডোমকল মহকুমা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেকার প্রশাসনিক বিভাজন বিবেচিত হয়েছে।

জঙ্গীপুর মহকুমা ঃ ফরাক্কার কাছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে নদীর মাঝিদের মধ্যে পানসৌ নামে একটি গানের প্রচলন ছিল। সম্ভবত পানসি শব্দ থেকে এ নামের উদ্ভব হয়ে থাকবে। গঙ্গা পদ্মার বুকে মাঝি - মাল্লাদের মধ্যে অনুসন্ধান করে একটি পানসৌ গানও সংগ্রহ করতে পারা যায় না। এ গান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন মাঝি মাল্লাদের মুখে শোনা যায় চলতি হিন্দি ও বাংলা ছবির গান।

সমগ্র জঙ্গীপুর মহকুমা জুড়ে আছে আলকাপ গানের চল। আলকাপ গান শুধু জঙ্গীপুরেই সীমাবদ্ধ নয়, গোটা জেলা জুড়েই ছিল এক সময় আলকাপ, লেটো, ছাঁচরা গানের রমরমা। বীরভূম ও বিহার থেকে আসত হরেক কিসিমের ঝুমুর নাচের দল। বস্তুত ঝুমুর গান থেকেই শিল্পীরা এক সময় জঙ্গীপুর, মালদহ ও সংলগ্ন রাজশাহী জেলাতে আলকাপ গানের প্রবর্তন করেন। মালদহের বোনাকানাকে আলকাপ গানের প্রবর্তক ভাবা হয়। গুমানি দেওয়ানের প্রথম দিকের পাল্লাদার ছিলেন হাসুপুরের বসন্ত সরকার। তিনি গোড়াতে ছিলেন আলকাপের শিল্পী। একশত থেকে দেড়শত বছরের মধ্যে আলকাপ লোকনাট্যের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে। আলকাপ গানকে বিশেষভাবে উন্নীত করেন জঙ্গীপুরের ধনপত নগরের ধনঞ্জয় মণ্ডল ওরফে ঝাকসু ওস্তাদ। সম্প্রতি তাঁর জন্মশতবর্ষ তাঁর জন্ম গ্রামে পালিত হয়েছে শ্রদ্ধায় ও আন্তরিকতায়। কিন্তু তাঁর শিষ্য সুধীর দাস, সোলেমান, মন্টু খাঁ, কন্যা চিনু মণ্ডল এরা পরিবর্তিত আকারে পঞ্চরস গানের সূচনা করেন। ঝাকসুর জীবন কালেই পঞ্চরস গানের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সাধারণত, স্থূলরসের নৃত্য-গীত ও তাৎক্ষণিক সংলাপের ভিত্তিতে অভিনয় এই লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য। আলকাপ কথাটির সাধারণ অর্থ - এলোমেলো কাপ বা কৌতুক নাট্য। মুর্শিদাবাদে সাধারণ মানুষের কাছে স্থূলরসের এই লোকনাট্যের বিশেষ কদর ছিল, এখনও আছে।

সৈয়দ মর্তুজার সমাধির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাধনসঙ্গিনী ছিলেন সতীদাহ প্রথার শিকার হিন্দু রমণী আনন্দময়ী। সৈয়দ মর্তুজা কয়েকটি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। সুতি থানার হিলোরা গ্রামের শ্যামচাঁদ ঠাকুর এবং বাজিতপুর গ্রামের সর্বেশ্বরের ভ্রাতৃত্রয় সারা বছর মেলায় ঘুরে বেড়ান। এই হিলোরা গ্রামেই এক আশ্চর্য লৌকিক দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই লৌকিক দেবীর নাম গড়িয়া। গড়িয়ার গানও গীত হয়। ঐ গ্রাম ছাড়া গড়িয়ার পূজা ও গান পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও হয় না। জঙ্গীপুর মহকুমায় মুসলিম, চাঁই ও রাজবংশী মেয়েরা বিয়ের সময় নৃত্য, বাদ্য ও কৌতুক সহ গান পরিবেশন করেন। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে মনসার গানের রেওয়াজ ছিল, এখনও আছে। বিহার থেকে আগত গোয়ালারা হোলির সময় চমৎকার নৃত্য ও সঙ্গীতসহ আনন্দ উৎসব পালন করে থাকে। চাঁই ও বিহারী গোয়ালারা ছট পরবে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ জেলার একমাত্র হাত পুতুলের দলটি টিকিয়ে রেখেছেন হিলোরা গ্রামের অগ্রণী শিল্পী শ্রী চন্দ্রশেখর ঘোষ ও তাঁর পুত্র। হাতপুতুলের মধ্যে দিয়ে তিনি গ্রামীণ মানুষের কাছে আনন্দ

ও লোকশিক্ষা দুই সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন।

জঙ্গীপুর কেন, সারা মুর্শিদাবাদের লৌকিক সম্পদ এখানকার কবি গান। কবি গানের মধ্যে দিয়ে তাৎক্ষণিক বাদ প্রতিবাদের গান সহ একটি বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে উত্তর প্রত্যুত্তর করা হয়। এক পক্ষে দেন চাপান, অন্য পক্ষে দেন উত্তর। এ সবই চলে গানের সুরে, তাৎক্ষণিক সংলাপে। ঢোলের তালে তালে চলে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর। লোকরঞ্জন ও লোকশিক্ষার একটি বিশিষ্ট মাধ্যম এ জেলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত কবিগান।

বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল গুমানি দেওয়ানের জন্ম হয়েছিল সাগরদীঘি থানার জিনদীঘি গ্রামে। তাঁর জন্মের শত বৎসর উপলক্ষ্যে তাঁর গ্রামে প্রতি বৎসর স্মরণ উৎসব ও কবিগানের অনুষ্ঠান হয়। জঙ্গীপুর মহকুমায় অনেক প্রাচীন ও নবীন কবিয়াল জন্মগ্রহণ করেছেন। হাসুপুরের বসন্ত সরকার, জাগলাই গ্রামের কমলাকান্ত মণ্ডল প্রাচীন কবিয়ালদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। তালাই গ্রামের শ্রীচরণ মণ্ডল ও তাঁর শিষ্যা, জেলার একমাত্র মহিলা কবিয়াল, গণকর গ্রামের দুলালী চিত্রকর আধুনিক কবিগানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১৯৭৬ - ৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় ও লোকায়ত শিল্পী সংসদের সহযোগিতায় এ জেলার কবিগান নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়। নাম বাংলার কবিগান। সেই তথ্য চিত্রে গুমানি দেওয়ান, রাঘব সরকার, দেবেন চৌধুরী, রমেশ শীল, লম্বোদর চক্রবর্তী প্রভৃতি প্রয়াত ও জীবিত কবিদের জীবনী ও গান পরিবেশিত হয়।

জঙ্গীপুরের গণকর গ্রামে এ জেলার লোক চিত্রকলা পটচিত্রের উন্নত একটি ঘরানার সৃষ্টি হয়েছিল। সে ঘরানা আজ অবলুপ্ত। এই ঘরানার একটি পটচিত্র লণ্ডনের অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এখানকার চিত্রকরেরা ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। মূর্তি নির্মাণ ও তাঁতের শানা তৈরী এদের জীবিকার অবলম্বন।

মুর্শিদাবাদের আদিবাসী জনসংখ্যার অনুপাত অত্যন্ত কম। সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ থানায় বেশ কিছু সাঁওতাল বাস করেন। এদের কিছু অংশ বিগত বৎসরগুলিতে ধীরে ধীরে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় রূপান্তর ঘটলেও তাঁরা তাদের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য অনুসারী জীবন যাপন, উৎসব-অনুষ্ঠান, পান-ভোজন ও নৃত্যগীতে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ১৯৭৩-এ সঙ্গীত নাটক একাডেমি চাঁদপাড়া মণিগ্রাম থেকে সোনা হেমব্রমের নেতৃত্বে সাঁওতালী নৃত্যগীতের একটি অনুষ্ঠানের তথ্যচিত্র গ্রহণ করেন। সেই তথ্যচিত্রটি দেশী বিদেশী গবেষকদের জন্য নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমিতে বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত করা আছে।

লোকভাষা ঃ লৌকিক ভাষার ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর এলাকার স্বাতন্ত্র্য সবিশেষ লক্ষণীয়, বিশেষত কথার টান ও উচ্চারণে। মুসলিম পরিবারের ভাষায় অবাঙ্গালী উচ্চারণে, দেহাতি হিন্দি ও উর্দু ভাষার মিশ্র ব্যবহার থাকে। বিহার থেকে আগত গোয়ালা ও চাঁইদের ভাষাতে আছে মিশ্র বাংলা ও দেহাতী হিন্দির সংমিশ্রণ। গাড়োলি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাসুদেবপুর ও রঘুনাথগঞ্জে বাস করেন। এদের স্বতন্ত্র পালপার্বন ও সঙ্গীতাদি আছে। এরা মেষপালক সম্প্রদায়। ভেড়ার লোমের কম্বল তৈরী করে এরা জীবিকা নির্বাহ করেন। বিহারী গোয়ালা, চাঁই প্রভৃতিরা পাহুর মারা উৎসব, হোলি উৎসব, ছট পরব ও বিবাহ অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত সহ আনন্দ উৎসব পালন করেন। মীর্জাপুরের তন্তুবায়দের মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত পদবীতে গ্রামনাম ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে। গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে মেয়েদের মধ্যে নানান ছড়া প্রবচন যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে নানা লোককাহিনী, প্রবাদ-প্রবচন ও কিংবদন্তী। জঙ্গীপুরের দুঃখভঞ্জন সান্যাল ও নরোত্তম সান্যাল মনোহর শাহী কীর্তন গানের বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে পরিচিত।

লৌকিক দেব-দেবী ও মেলা উৎসব ঃ জঙ্গীপুর মহকুমার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অনেক লৌকিক দেবদেবীর মন্দির ও স্থান। এই সকল লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় নানা পালপার্বণ, মেলা ও উৎসব। মনসা, কালী, গাজন ও চড়কের উৎসব ও মেলা ছাড়াও জিয়ৎকুঁড়ি গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে জিয়ৎকুণ্ডেশ্বরী দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। বহুতালি গ্রামে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা ছাড়াও মহরম উপলক্ষ্যে ব্যাপক জনসমাগম হয়। হিলোরা গ্রামে শ্যামচাঁদের বনবিহার উৎসব ও কালীপূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে। এই গ্রামে জোরান বিবির উৎসবে ও রাজবংশী পল্লীতে গড়িয়ার উৎসবে ভক্ত সমাবেশ হয়। ধুসুরীপাড়ায় পদ্মাদেবীর পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। মাঘ মাসে রাজরাজেশ্বরী পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। রমাকান্তপুরে রক্ষাকালী মায়ের মেলা হয় চৈত্র মাসে। আলমপুরে বৈশাখ মাসে হয় মহামায়া মেলা। রঘুনাথগঞ্জ থানার মণ্ডলপুর গ্রামে সাঁওতালরা স্ব স্ব গৃহে কালীপূজা করে থাকেন। আবার বাধ্না পরবেও এরা ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বারালা গ্রামে চৈত্র গাজনের মেলায় ও মীর্জাপুর গ্রামে শীতলা দেবীর পূজা উপলক্ষে বৈশাখ মাসে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিপুল জনসমাগম হয়। মণ্ডলপুর গ্রামে বুড়ো শিবের গম্ভীরা উৎসব হয় মাঘ মাসে। এই উপলক্ষে অভিনব বোলান গান পরিবেশিত হয় এই গ্রামে। সেকেন্দ্রা গ্রামে কার্তিক মাসে হয় কৃষ্ণকালী পুজো ও মেলা। রঘুনাথপুরে চৈত্র মাসে ব্রহ্মা পূজায় এবং সাগরদীঘি থানার বন্যেশ্বরের শিবের মেলায় বিপুল জনসমাগম হয়। কান্তনগর গ্রামে মনসাপুজো উপলক্ষ্যে শ্রাবণ মাস জুড়ে বসে বিরাট মেলা। হারোয়া গ্রামে

মর্তুজার বাৎসরিক স্মরণ উৎসবে বাইরে থেকে অনেক ভক্তের আগমন হয়। সৈয়দ মর্তুজা, শ্যামচাঁদ ঠাকুর, জিয়ৎকুণ্ডেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী, পেটকাটি মা, শেখদীঘি, সাগরদীঘি, মহীপালকে ঘিরে নানান লোককথা ও কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। জঙ্গীপুর শহরে তুলসী বিহার উপলক্ষে বিরাট উৎসব ও মেলা হয়। দুর্গা পূজায় বিসর্জনের সময় রঘুনাথগঞ্জের গঙ্গাতীরে নৌকা বাইচ্ দেখতে বহু লোকের সমাগম ঘটে। চাঁদপাড়া, মণিগ্রাম ও বিভিন্ন সাঁওতাল ও আদিবাসী পল্লীতে ছোট বাধ্না পরব, বিবাহ ও সামাজিক উৎসবে সমবেত পানভোজন ও নৃত্যগীতের ব্যাপক রেওয়াজ আছে।

লালবাগ মহকুমা ঃ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহরকে ঘিরে হিন্দু, মুসলিম, জৈন ধর্মাবলম্বীদের বসত কেন্দ্রগুলি পাশাপাশি অবস্থিত। লালবাগে যেমন নবাবী আমলের অসংখ্য পুরাবস্তু ছড়িয়ে আছে, তেমনি মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন সাধকবাগ, নসীপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, ডাহাপাড়া ও বড়নগরে হিন্দু ও জৈন পুরাকীর্তির অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। বিবিধ ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি অবস্থানের কারণে সকল ধর্মের উৎসব পালপার্বণে ভিন্ন ধর্মের মানুষ জনের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছে।

মহরম উপলক্ষে লালবাগ শহরে কেল্লা ময়দানে বসে বিরাট মেলা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে জারিগানের দল। এখানে মহরমের আগে থেকে শুরু হয় আগুন ঝাঁপ ও নানা রকম শারীরিক কৃচ্ছসাধন যা অনেকটা গাজন উৎসবের ভক্তদের কৃচ্ছসাধনের অনুরূপ। কেল্লা নিজামতের ভিতরে চলে কয়েকদিন ব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মর্শিয়া গান। ভাদ্রের শেষ বৃহস্পতিবারে গঙ্গার বুকে বেরা ভাসান উৎসব, যা এখানকার নিজস্ব। সাধকবাগে আউলিয়া পন্থীদের আস্তানাতে ও নসীপুরের রাজবাড়ীতে ঝুলনযাত্রায় মেলা বসে ও বিপুল জনসমাগম হয়। ডাহাপাড়ায় জগৎবন্ধু ধামে বাৎসরিক উৎসব ও মেলায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্ত সমাগম হয়। প্রাচীন বালুচর তথা জিয়াগঞ্জে আছে সুবিখ্যাত বড় গোবিন্দের মন্দির। এখানে মণিপুর রাজ ভাগ্যচন্দ্র ও বৈষ্ণব পণ্ডিত নরোত্তম দাস ঠাকুরের সমাধি আছে। ঝুলনের সময় ও অন্যান্য সময়ে সুদূর মণিপুর থেকেও অনেক ভক্ত ও দর্শকের সমাগম হয়। জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে আছে অনেক সুদৃশ্য জৈন মন্দির। ভারতের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে বৎসরের সকল সময়ে এখানে অনেক জৈন সাধু ও জৈন পর্যটক আসেন। জৈন পালপার্বণে স্থানীয় হিন্দুরা ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করেন। লালবাগের গঙ্গাতীরে আছে একটি সাধক বৈষ্ণবের আখড়া। এখানে ও গঙ্গার অপর পারে পীরের আস্তানায় বাৎসরিক উৎসবে বিপুল জনসমাগম হয়। এলাহিগঞ্জ ও নতুনগ্রামে কয়েকজন বাউল বিয়ের গীতের শিল্পী, জারিগানের শিল্পী, শব্দ গানের শিল্পী বাস করেন। জিয়াগঞ্জে বাস করতেন ভারতখ্যাত পদাবলী কীর্তনের শিল্পী রাধারাণী দেবী। ইনি মুর্শিদাবাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুর ও আঙ্গিকে কীর্তন গান পরিবেশন করে ভারতখ্যাত হয়েছেন। লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম থানা লোকসংস্কৃতির আকরক্ষেত্র। এখানে আদিবাসী নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক, আদিবাসী পালপার্বন থেকে কবিগান, রায়বেঁশে, ঢোলবাদ্য, মুসলিম বিয়ের গীত, বাউল গান, কাহানী, বোলান গান, মনসা গান, পীরের গান ও কীর্তন গানের অনেক শিল্পী গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে আছে। সিঙ্গার ও পলসণ্ডা গ্রামে দুটি প্রাচীন বাউলের আখড়া আছে। নবগ্রাম থানার পমিয়া গ্রাম থেকে শ্রীযুক্ত যমুনাপ্রসাদ মণ্ডল একটি সুপ্রাচীন চণ্ডীর পাঁচালী পুঁথির সন্ধান পেয়েছেন। এই পুঁথিতে লিপিবদ্ধ চণ্ডীর পাঁচালী গান শত শত বছর ধরে মাকরী সপ্তমী উপলক্ষ্যে গীত ও পরিবেশিত হয়। এই চণ্ডীর পাঁচালী এ জেলার লোকসংস্কৃতির এক অমূল্য দলিল। এই পুঁথি গানের মধ্য দিয়ে প্রায় হাজার বছর আগেকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস পাওয়া যায়। পলশা গ্রামে মুসলিম মেয়েরা চমৎকার বিয়ের গীত পরিবেশন করেন এবং এঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই গীত পরিবেশন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এলাহিগঞ্জের বুলু বিবি এ জেলার প্রথম মহিলা শিল্পী যিনি এই বিয়ের গীতকে প্রথম জেলায় ও জেলার বাইরে পরিবেশন করেন। এ জন্য তাঁকে সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ভগবানগোলা থানার গ্রামাঞ্চলে আছে অনেক বিয়ের গীতের শিল্পীর দল, বাউল ফকির এবং ভগবানগোলা থানার সুন্দরপুর ও ওরাহর গ্রামে আছে আলকাপ, ঘোড়া নাচ, মনসা গান, জারি, বোলান, কাহানী ও গোরক্ষ নাথের গানের শিল্পী। বর্ষার সময় কৃষিকাজের অবসরে কাহানী শোনার ব্যাপক রেওয়াজ আছে এই অঞ্চলে। একটি 'কাহানী'কে তার শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত করে ছড়া ও গান সহযোগে একটি গ্রামে প্রায় এক মাস ধরে পরিবেশন করা হয়। এই কাহানী শোনার আশ্চর্য মাদকতায় আবিষ্ট হয়ে যান গ্রামের সাধারণ মানুষ।

গ্রাম্য দেবদেবী ও মেলা ঃ ভগবানগোলায় আছে রামচন্দ্র কবিরাজের আখড়া ও দাদাপীর সাহেবের সমাধিস্থান। তেলিয়া বুধুরী গ্রামে ও রাণীনগর থানার গোয়াস গ্রামে এককালে বৈষ্ণবচর্চার কেন্দ্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কীর্তন গানের প্রচলন ছিল। দেবীপুর গ্রামে মাঘ মাসে হয় কৃষ্ণজননী পূজা। গিরিধারীপুরে গঙ্গাপূজা উপলক্ষ্যে বসে বিরাট মেলা। জিয়াগঞ্জে নেহালিয়ায় ঝুলনযাত্রায় বসে জমজমাট যাত্রা গানের ও আলকাপের আসর। পাঁচদিন ব্যাপী বিরাট মেলা বসে এখানে। অমরকুণ্ড গ্রামে গঙ্গাদিত্য পুজোর মেলা ও পৌষ মাসে কিরীটেশ্বরী দেবীর প্রাঙ্গণে বাৎসরিক মেলা ও উৎসব হয়। নবগ্রাম থানার কোন কোন গ্রামে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এখনো সংগানের প্রচলন আছে।

বহরমপুর মহকুমা ঃ বহরমপুর তথা সদর মহকুমায় বহু বিচিত্র ধরণের লৌকিক সঙ্গীতাদি ছড়িয়ে আছে। সাটুই, কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে আদিবাসী, সাঁওতাল ও ওঁরাও বাস করেন। সারা বছর জুড়ে তারা বাধ্না, করম প্রভৃতি উৎসব নৃত্যগীত সহ পরিবেশন করেন। নওদা থানার আমতলা গ্রামে কয়েক ঘর ব্যাধ বাস করেন। এঁরা নিজেদের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছেন। এঁদের ছেলেমেয়েরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে হাপু গান পরিবেশন করে জীবিকা নির্বাহ করে। গঙ্গা তীরবর্তী স্থানে দিয়ার অঞ্চলে চাঁই, বিন্দ, মুসাহার প্রভৃতি বহিরাগত সম্প্রদায় বাস করেন। এঁরা নিজেদের মধ্যে দেহাতি হিন্দির সঙ্গে বিকৃত বাংলার সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলেন। এঁরা প্রধানত ছট পরবে অংশগ্রহণ করেন।

বাউল, শব্দ গান, কবি গান, বোলান গান, পাঁচালী গান, কীর্তন, সংগান, সারিগান, মেলেনীর ছড়া, গুবা নৃত্য, ঢাক, ঢোল, বাদ্য, মনসার গান, আলকাপ, বিয়ের গীত, জারিগান, কাহানী এবং আদিবাসী নৃত্যগীত এই মহকুমার সর্বত্র দেখা যায়। এক সময়ে বেলডাঙ্গার লৌকিক ঢপ কীর্তনের খুব প্রচলন ছিল। ঢপ গায়ক রূপচাঁদ অধিকারী এক কালে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁকে নিয়ে একটি প্রচলিত ছড়া -

'বাজলোরে রূপচাঁদের ঢোল
মাগিরা সব চরকা তোল'

বাঁশচাতোর গ্রামের তরুণ বাউল সৌমেন বিশ্বাস ভারতের সর্বত্র এ জেলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাউল গান পরিবেশন করে সুখ্যাত হয়েছেন। তাঁর গুরু সাটুই গ্রামের মনমোহন দাস ছিলেন একজন তাত্ত্বিক বাউল। লোকায়ত শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে রাশিয়ায় মস্কোতে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবে বাঁশচাতোর গ্রামের ঢাক ও ঢোল বাদকবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং জেলার লোকবাদ্য পরিবেশন করে আন্তর্জাতিক স্তরে এ জেলার গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বহরমপুর মহকুমায় সাটুই, রাধারঘাট, বানীনাথপুরে আছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন বাউলের আখড়া। রাধারঘাটে বাউল গানের ও বাউল নৃত্যের প্রবীন শিল্পী শশাঙ্ক দাস বাউল দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন। এখানে বাউল তত্ত্বের সাধক নিতাই দাস বাউল ও ষষ্ঠী দাস বাউলানীর আখড়া আছে। সাটুই গ্রামে মনমোহন দাসের গুরু তাত্ত্বিক বাউল সদানন্দ দাসের আখড়া ছিল। বানীনাথপুরে বিশিষ্ট বাউল গোপালদাসের আখড়ায় ১৯৭৩ সালে নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমি এ জেলার আখড়াধারী বাউলদের জীবন যাপন পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বাউলের গান চিত্রায়িত করেন। এই তথ্যচিত্র নূতন দিল্লীর সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত আছে। এই আখড়াতে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় বাউল গানের উপর একটি তথ্যচিত্র গৃহীত হয়েছিল। হরিহরপাড়ায় লালনগরে শব্দগানের সুখ্যাত শিল্পী ঈশপ শেখ বাস করতেন। ডোমকল থানা, হরিহরপাড়া, নওদা, বহরমপুর, জলঙ্গী, বেলডাঙ্গা, রেজিনগর থানা এলাকার গ্রামাঞ্চলে অনেক গৃহী ও আখড়াধারী সহজিয়া ফকির বাস করেন। এঁরা উদার, মানবতাবাদী দেহতত্ত্বের গান গেয়ে নিজস্ব পন্থায় সাধন ভজন করে থাকেন। এঁরা শরিয়তি শাসনের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন না। তার ফলে কখনও কখনও শরিয়তপন্থীদের রক্তচক্ষু এদের প্রতি প্রদর্শিত হয়। এঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নিয়মরীতি মান্য করেন না। জাতপাতের ভেদও স্বীকার করেন না।

সাটুই-এর কাছে পোড়াডাঙ্গা গ্রামের হরিনারায়ণ দে ও হরিমাখন দে কবিগানের ক্ষেত্রে কিংবদন্তীতুল্য শিল্পী ছিলেন। এঁরা যেমন কবিগানের ধারাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি এঁরা বাউল, বোলান ও পাঁচালী গানের রচয়িতা হিসাবে সুখ্যাত ছিলেন। বেলডাঙ্গার বিশুরপুকুরে গুবানাচের একাধিক দল আছে। এঁরা জাতীয় ও রাজ্যস্তরে এই নৃত্য পরিবেশন করেছেন। সদর মহকুমার দক্ষিণপ্রান্ত জুড়ে রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চলে চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত গাজন উৎসবে প্রায় প্রতিটি গ্রামে বোলান গান শোনা যায়। ডোমকল, জলঙ্গী, হরিহরপাড়ার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে কবি, আলকাপ, মনসা, বিয়ের গীত, শব্দ ও ফকিরি গানের শিল্পীবৃন্দ। বহরমপুর শহর সংলগ্ন অঞ্চলে শীতকালে পৌষ মাসে এক সময় ভাঁড়বোলের খুব প্রচলন ছিল, এখনো আছে। গোরাবাজার অঞ্চলে এবং কাশিমবাজারে কয়েকজন কীর্তন ও বাউল গানের শিল্পী আছেন। বহরূপী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বহরমপুর শহরের কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। এরা প্রধানত পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলা থেকে আসেন। বহরমপুর শহরে বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রবীণ অন্ধ কীর্তন শিল্পী। সৈদাবাদ, নিয়াল্লিশপাড়া, আঁধারমানিক, দো-পুকুরিয়া গ্রামগুলি প্রাচীন বৈষ্ণব ও কীর্তন চর্চাকেন্দ্র হিসাবে সুবিখ্যাত।

গ্রাম্য দেব দেবী ও মেলা ঃ সাদিখাঁর দিয়ারের রক্ষাকালী দেবীর পূজা উৎসব হয় বৈশাখ মাসে। সে উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভগীরথপুরে জামাইষষ্ঠীর সময় মেয়েরা দই মেলা নামে একটি আচার অনুষ্ঠান করে থাকেন। বাঁশচাতোর গ্রামে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে ধর্মরাজ পুজো উপলক্ষে শোভাযাত্রা, কবিগান, সারিগান, গুবা নৃত্য, সংগান প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। বালি গ্রামে হয় ধর্মরাজের পুজো। রুকুণপুরে আছেন কয়েকজন কবিয়াল। এখানে একটি বাউলের আখড়াও আছে। এখানে ন্যাংটা তলায় বাৎসরিক উৎসব ও মেলা হয়। অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে ও মেলা বসে। নিশ্চিন্তপুর গ্রামে সর্বমঙ্গলাদেবীর পুজো উপলক্ষ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসে মেলা বসে। দলুয়া গ্রামে কুলাইচণ্ডী নামে লৌকিক দেবীর পুজো হয় বৈশাখ মাসে। ন'পুকুরিয়াতে আছেন ডুমনি মা। সেখানে হয়

বাৎসরিক উৎসব। রামপাড়াতে কয়েক ঘর সাপুড়িয়া বাস করেন। এঁরা সাপ খেলিয়ে ঝাঁপান গান পরিবেশন করেন। এই গ্রামে ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে মেলা হয়। দো-পুকুরিয়া গ্রামে একটি কীর্তন শিক্ষা কেন্দ্র আছে। মনোহর শাহী কীর্তনের স্বনামধন্য শিল্পী নন্দকিশোর দাস এই গ্রামে বাস করতেন। ১৯৭৩ এ সঙ্গীত নাটক একাডেমী তাঁর গানের তথ্যচিত্র গ্রহণ করেছেন। শক্তিপুর গ্রামে বাস করতেন আর একজন প্রখ্যাত শিল্পী পঞ্চানন দাস। সর্বাঙ্গপুর সংলগ্ন বিলের জলাশয়ে বর্ষার শেষে নৌ-বাইচ প্রতিযোগিতায় স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আঁধার মানিক গ্রামে সারা বৈশাখ মাস জুড়ে হয় শীতলার পুজো ও মেলা। এখানকার শীতলা দেবী নিয়ে আছে নানান কিংবদন্তী। বহরমপুরের বিষ্ণুপুর কালীবাড়ীতে পৌষ মাস জুড়ে বিশেষ পুজো উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কান্দী মহকুমা ঃ মুর্শিদাবাদের দক্ষিণপ্রান্ত উত্তর রাঢ়ভূমে সুপ্রাচীন জনপদ কান্দী মহকুমা লৌকিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক কারণের জন্য জেলার যাবতীয় লৌকিক সংস্কৃতির উপাদানগুলি এখানে ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়। এ মহকুমার সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহৎ লোকউৎসব গাজন উৎসব। চৈত্রের গাজন উপলক্ষ্যে শেষ কটা দিন ভক্তদের ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানে নানাবিধ নৃত্য, বাদ্য ও সঙ্গীতাদির উপস্থাপনায় গ্রাম জনপদ চঞ্চল হয়ে ওঠে। ব্রাত্য জনগণের প্রাণের উৎসব এই গাজন উৎসব। প্রধানত শিবকে নিয়েই এই উৎসব। এই উৎসবে বৌদ্ধ তন্ত্রাচারের সঙ্গে শৈব ধর্মের মিলন ঘটেছে। কান্দীর রুদ্রদেব আসলে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানরত এক বুদ্ধ মূর্তি। এখন শিবরূপে পূজিত। বড়ঞা গ্রামে মদনেশ্বরের শিব মন্দিরে শিবলিঙ্গের সাথে এক বুদ্ধ মূর্তিও পূজিত হচ্ছেন। জজানের সর্বমঙ্গলার মন্দিরে অধিষ্ঠিতা দেবী সর্বমঙ্গলা প্রচলিত বৈদিক মন্ত্রে পূজিতা হন না। এঁর পূজা পদ্ধতি স্বতন্ত্র। দেবীর আবরণ মূর্তির নীচে একটি বৌদ্ধ তন্ত্রের জ্যামিতিক যন্ত্র স্থাপিত আছে যা বৌদ্ধ তন্ত্রাচারের স্মৃতিবাহী। এই সকল স্থানে গাজন উৎসবে হোম পূজা, ভক্তনৃত্য ও চড়কের বেজায় ধূমধাম হয়। জাগরণের রাতে লোক কবিগণ রচিত পুরাণ ও ইদানীং সামাজিক বিষয়ের উপর রচিত বোলান ও পাঁচালীগান পরিবেশিত হয়। জাগরণের রাতে রুদ্রদেবের মন্দিরে, জজানের সর্বমঙ্গলার মন্দিরে ও অন্যান্য গ্রাম্য দেবীতলায় ভক্তদের ভয়ঙ্কর বেশে পিশাচ নৃত্য, ডাকিনী ও যোগিনী নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। রুদ্রদেবের মন্দিরে, কালিকাপাতার ভক্তবৃন্দ আস্ত মরা নিয়ে নৃত্য করেন। সঙ্গীত নাটক একাডেমী সুদূর মাদ্রাজে ১৯৭৫ সালে লোকায়ত শিল্পী সংসদের সহযোগিতায় রুদ্রদেবের পিশাচ নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজের পূজানুষ্ঠানে অনুরূপ ভাবে ভক্তদের নৃত্য, শারীরিক কৃচ্ছসাধন, আগুন ঝাঁপ এবং বোলান ও পাঁচালী গানের আসর বসে। মহরম উপলক্ষ্যে কান্দী অঞ্চলে লাঠি খেলা এবং জারিগান পরিবেশিত হয়। কারবালা প্রান্তরে অসম যুদ্ধের করুণ গাথা লোককবি দ্বারা রচিত জারিগানে মরু প্রান্তরের বিষাদ বেদনা নিয়ে সাধারণ মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সাহোরা, বল্লভপুর, কুজুরা, জীনপাড়া, মহাদিয়া প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি প্রাচীন বাউলের আখড়া আছে। রাধাপদ দাস, ভক্তিদাস, লক্ষ্মণ দাস (শিমুলিয়া আখড়া), চমৎকার শেখ, সালাম শেখ, ভবানী দাসী, কানাই দাস, ব্রজেশ দাস, দুলাল দাস এই অঞ্চলের বাউলদের জীবনাচার ও তত্ত্ব জ্ঞানের যথার্থ প্রতিভূ ছিলেন। এঁরা দেহতত্ত্বের গানে, নৃত্যে, সুরে ও বাদ্যে বাউল গানের ধারাকে উন্নীত করেছিলেন। লোকায়ত শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে তরুণ বাউল নিমাই দাস ও নিহারিকা দাস স্পেন, রাশিয়া, জার্মানী ও প্যারিসে বাউল গান পরিবেশন করে এসেছেন। এঁরা জার্মানীতে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। জজানের নিবারণ দাস, জীবন দাস প্রমুখ ঢোলবাদক রাশিয়ায় ভারত উৎসবে অংশগ্রহণ করে সুখ্যাত হয়েছেন। কান্দী মহকুমা জুড়ে আছে মৃদঙ্গবাদনের ব্যাপক চর্চা। শ্রীচৈতন্যদেব রাঢ় ভ্রমণকালে এই অঞ্চলের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ বৈষ্ণব পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক অনেকগুলি বৈষ্ণব চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করেন ও মনোহর শাহী কীর্তনের গুরুবাদী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করেন। ভরতপুর, জলসুতী, দক্ষিণখণ্ড, মালিহাটি, পাঁচথুপি, টগড়া, মারগ্রাম, টেঁয়া, বদ্যিপুর প্রভৃতি গ্রামে অনেক বৈষ্ণব সাধক, পদকর্তা, কীর্তনীয়া ও মৃদঙ্গবাদকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তার ফলে এখানকার জনজীবনে ও জন সংস্কৃতিতে বৈষ্ণবীয় আচার ও সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব সাধকদের বাৎসরিক স্মরণ উৎসবে ও সারা বৈশাখ মাস জুড়ে নগর সংকীর্তন, মনোহরশাহী কীর্তন গান ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের সমাবেশ হয়। এই অঞ্চলে প্রচলিত মনোহরশাহী কীর্তন গানে উচ্চাঙ্গ ও লৌকিক রীতির সম্মিলন ঘটেছে। এই অঞ্চলে অনেক প্রতিভাধর কীর্তনীয়া কীর্তন গানের ধারাকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তদের কাছে পরিবেশন করেছেন। মুনিয়াডিহি গ্রামের বৈষ্ণবদত্ত ঘরানার মৃদঙ্গী ব্রজরাখাল দাস ও প্রেমানন্দ বড়ালের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মালিহাটি, মাজিয়ারা, দক্ষিণখণ্ড প্রভৃতি গ্রামের বৈষ্ণব গুরুগণ কথকথার ধারাকে এখন ও অব্যাহত রেখেছেন। এক সময় এই অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গলের গান ও রামায়ণ গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। আমলাই, মাসলাই, গড্ডা, সিংহারী প্রভৃতি গ্রামের রামায়ণ গায়কবৃন্দ এক সময় গ্রামে গ্রামে রামায়ণ গান পরিবেশন করতেন। সর্বশেষ সুখ্যাত রামায়ণ গায়ক ছিলেন বড়ঞা থানার কল্যাণপুর গ্রামের অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। মনসা পুজো উপলক্ষে পক্ষকাল ব্যাপী

মনসা গানের পালার প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে মনসার গায়কদের আর সে ভাবে দেখা যায় না। বড়এ(া থানার রাজহাট গ্রামের শিবরাম পাল ছিলেন মনসার গানের এক প্রতিভাধর শিল্পী। কাঁতুর, ছাতিনা কান্দী, দ(িণখণ্ড, পাঁচথুপি প্রভৃতি গ্রামের পটুয়ারা (বেদিয়া) পটের গান ও সাপের ঝাঁপি নিয়ে মনসার ঝাঁপান গান গ্রামে গ্রামে পরিবেশন করে থাকেন। সিয়াটা মণ্ডলপুরের লৌকিক দেবী মনসার দেয়াসীগণ সারা বছর গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঢাক বাজিয়ে মনসার গান পরিবেশন করে থাকেন। ছোট কাপসা, বড় কাপসা, রাজহাট প্রভৃতি গ্রামে বগা-পঞ্চমী উপল(মনসা পূজা উৎসব ও মেলা হয়। পুরন্দরপুরে মনসাতলায় সারা জ্যৈষ্ঠ মাস জুড়ে মনসার বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংত্র(ান্তি থেকে প্রতি গৃহস্থ বাড়িতে সর্প বিষ প্রতিষেধক স্নুহি বৃ(র পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। অগ্রহায়ণ সংত্র(ান্তি থেকে প্রতি গৃহস্থ বাড়িতে ইতু লক্ষ্মীর পূজা উপল(বাঁশের লগা রোপন করে পূজার রেওয়াজ আছে।

মুর্শিদাবাদের লোকরঞ্জন ও লোকশি(ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম কবি গান। কান্দী মহকুমার সমস্ত প্রান্তে অনেক কবিয়াল, ঢুলি, দোহার ছড়িয়ে আছে। কবি গানই এঁদের প্রধান বা আংশিক জীবিকার অবলম্বন। প্রাচীন কবিয়ালদের মধ্যে মণিগ্রামের আব্দুল জুব্বার, শিশুয়া গ্রামের সৃষ্টিধর কোটাল, ভরতপুরের রাঘব সরকার, হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের জসিমুদ্দিন, সতীতারা গ্রামের জ্যোতিষ কোনাই এর নাম উল্লেখযোগ্য। নব্বই শতকের গোড়ার দিকে লোকায়ত শিল্পী সংসদের প(থেকে মুর্শিদাবাদ নদীয়া ও বীরভূমের তিন শতাধিক কবিগানের শিল্পীকে জমায়েত করা হয় কান্দীতে। এই সংসদের উদ্যোগে কান্দীতে কবিগান, ঢোলবাদ্য, কীর্তন শি(া, মৃদঙ্গ বাদনের প্রশি(ণ দেওয়ার জন্য শি(াকেন্দ্র স্থাপিত হয়, কিন্তু সে উদ্যোগ বেশীদিন র(া করা যায় নি। ১৯৭৬ এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও এই সংসদের যৌথ উদ্যোগে কবি গানের উপর একটি তথ্যচিত্র গৃহীত হয়। পাঁচথুপির ব্রাহ্মণ সন্তান ওরম্বা ওস্তাদ এই অঞ্চলে ঢোল বাদনের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদের পটুয়া শিল্পীদের নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় পটচিত্রের দুটি ঘরানা। গণকর ঘরানার অবলুপ্তি ঘটেছে। কান্দী ঘরানাও বিলুপ্তির পথে। ১৯৭৬-৭৭ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমী ও লোকায়ত শিল্পী সংসদের যৌথ উদ্যোগে কান্দীতে লুপ্তপ্রায় এই ধারাকে র(ার জন্য প্রশি(ণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই সংসদের দুজন শিল্পী বাঁকু পটুয়া ও কালাম পটুয়া কান্দী ঘরানার পটচিত্রকে তাদের সাধনার দ্বারা ধরে রেখেছেন। এঁরা কান্দী ঘরানার পটচিত্র ও পটের গান বিদেশে প্রচার করে এসেছেন। এক সময় মাজিয়ারা গ্রামে উন্নতমানের পটচিত্র অঙ্কিত হ'ত। এ গ্রামে আজ আর কোন পটুয়া নেই। বর্তমানে কাঁতুর, পাঁচথুপি, আয়রা, ঝিল্লি, ছাতিনা কান্দী, গোকর্ণ, আমলাই, দ(িণখণ্ড, সোনা(ন্দি প্রভৃতি গ্রামে পটুয়ারা বাস করেন। এবং এঁরা মাত্র কয়েকজন গ্রামে গ্রামে পটচিত্র দেখিয়ে পটের গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। পটুয়াদের বৈশিষ্ট্য হল এঁরা ধর্মে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম হলেও এঁরা হিন্দু পুরাণের কাহিনী এঁকে পটের গান করেন এবং পটের গানের মধ্যে দিয়েই গ্রামে গ্রামে ঘুরে ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দের বোধ মানুষের মনে সঞ্চারিত করেন। এঁরা প্রাচীন লোকশি(ক।

এক সময় গ্রামে গ্রামে হাতপুতুল দেখিয়ে ছোট ছেলেদের আনন্দ দিতেন হাতপুতুলের শিল্পীর দল। তাঁরা আজ আর নেই। আমলাই গ্রামে ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে দুটি দণ্ডপুতুলের দল কোন ত্র(মে টিকে আছে। এঁরা প্রধানত রথযাত্রা উপল(্যে অথবা ধর্মরাজ পুজোয় এই দণ্ডপুতুল প্রদর্শন করে থাকেন।

কান্দী অঞ্চলে রথযাত্রা, ধর্মরাজ পুজো, গাজন প্রভৃতি উপল(্যে সংগানের প্রচলন আছে। সংগান হচ্ছে ছোট কৌতুক নাটিকা। এই নাটিকার মধ্য দিয়ে গ্রামজনতা সামাজিক অন্যায় ও নিষ্পেষণের বি(দ্ধে হাস্য কৌতুক, (-ষ ও ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে নৃত্য, গীত ও তাৎ(নিক সংলাপের সঙ্গে কৌতুক রস মিশিয়ে নিজেদের (োভ, বেদনা ও অভিযোগ ব্যত্ত(করেন। এই নাটিকা গ্রামের রাস্তায় গ্রামীণ মানুষের জমায়েতে পরিবেশিত হয়।

মুর্শিদাবাদ তথা কান্দী অঞ্চলের লোকনৃত্যের ধারাটি রাইবেঁশে লোকনৃত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। বড়এ(া অঞ্চলে আকবরের সময়ে মানসিংহের সঙ্গে এই অঞ্চলের হাড়িরাজার যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে হাড়ি রাজা ফতেসিং পরাস্ত হন। বিজিত ও বিজেতা সৈন্য সামন্তগণ এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। রত্তে(যাদের যুদ্ধের নেশা, সেই ভল্লা, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ মানুষেরা এই অঞ্চলে বীরত্ব-ব্যাঞ্জক ও শারীরিক কসরত সমৃদ্ধ লোকনৃত্য রাইবেঁশে উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে কাঁতুরে দুটি রাইবেঁশে দল আছে। কল্যাণপুর গ্রামে ও আলুগ্রামে দুটি রাইবেঁশের দল গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে গ্রামের বিবাহ উপল(রাইবেঁশের নৃত্য প্রদর্শন ও ঢোল বাদ্য খুবই জনপ্রিয়। এই সম্পর্কে একটি মজাদার ছড়া আছে -

'দাদার বিয়ে যেমন তেমন
দিদির বিয়ে রাইবেঁশে
আয় ঢকাঢক মদ খেসে'।

বিয়ে উপল(্যে কখনও কখনও কাবারি ও রঙ্গিন কাগজে তৈরী ঘোড়ানাচের রেওয়াজ আছে। জীনপাড়া, সোনাভাড়ুই প্রভৃতি গ্রামে ঘোড়া নাচের শিল্পীরা বাস করেন।

মাজিয়ারা গ্রামে দুর্গাপূজার সময় এক অভিনব অনুষ্ঠান হয়। গ্রামবাসীরা সমবেত ভাবে আগমনী গান গেয়ে দুর্গাকে আবাহন করেন এবং বিসর্জনের পরে সমবেত ভাবে বিজয়ার গান গেয়ে

তারা ঘরে ফেরেন। এ আগমনী গান ও বিজয়ার গান গ্রামবাসীদেরই রচনা।

মুসলিম বিবাহ উপলক্ষ্যে মহকুমার মুসলিম রমণীগণ হাতঢোল বাজিয়ে, নৃত্য সহযোগে বিয়ের গীত পরিবেশন করে থাকেন। কান্দী মহকুমায় এখনও গ্রামে গ্রামে বহুরূপীদের দেখা পাওয়া যায়। কোন দিন এঁরা সাজেন মা-কালী, কোনোদিন হনুমান বা বাঘ। গ্রামে গ্রামে কৃষিজীবী কুমারী মেয়েরা ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশীর দিন থেকে বীজ পাত্রে বিভিন্ন শস্যের বীজ ছিটিয়ে অঙ্কুরোদগম করেন। তাঁরা ছড়া কাটেন বীজপাত্রকে ঘিরে। এটি বীজ সংরক্ষণ ও বীজ পরীক্ষার একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এই ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে কুমারী হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শস্য উৎপাদনের বিষয়টি একীভূত হয়ে গিয়েছে। ভাদ্র মাসে গ্রামে গ্রামে ঢোল বাজিয়ে ছোট একটি ভাদু মূর্তি নিয়ে নৃত্যসহ গান করে প্রণামী সংগ্রহ করা হয়। কান্দী মহকুমায় এক সময় কৃষ্ণযাত্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল। পীরের গানের দলও এক সময় ছিল অনেক। কিন্তু বর্তমানে তা আর চোখে পড়ে না।

খড়গ্রাম, কান্দী, বড়ঞা থানায় বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েক ঘর সাঁওতাল ও ওঁরাও বাস করেন। এঁরা নিজেদের ঐতিহ্য মত বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নৃত্যগীত, পানভোজন সহ নিজেদের উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করেন। বাধনা, করম এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আদিবাসী পরব। কুণ্ডল গ্রামের সাঁওতালী নৃত্যগীতের দলটি এ অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিচিত।

মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষত কান্দী মহকুমায় গ্রামের মেয়েরা সারা বছর জুড়ে নানারকম মেয়েলি ব্রত করে থাকেন। কুমারী মেয়েরা করেন ভাঁজো, সাঁজ পুজুনি, পুণ্যিপুকুর ব্রত। বর্তমানে মেয়েলি ব্রত অনুষ্ঠানের পূর্বেকার রমরমা না থাকলেও মেয়েরা ব্রতকথা পাঠ, ব্রতের ছড়া আবৃত্তি ও গৃহ প্রাঙ্গণে চালের গোলা দিয়ে আলপনা দিয়ে থাকেন। রাঢ় মুর্শিদাবাদে প্রচলিত ব্রত কথাগুলি সংকলন করে ইন্দুমতী দেবী 'বঙ্গনারীর ব্রত কথা' প্রকাশ করেছেন। এই ব্রতকথাটি এই অঞ্চলে অধিক জনপ্রিয়। লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, শিবরাত্রি, সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্রতগুলি মেয়েরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। ব্রত কথা ও ব্রতের ছড়া ছাড়াও মেয়েদের মধ্যে নানা ধরণের মেয়েলি ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন এসব পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের স্থাননাম নিয়ে একটি মজাদার ছড়া মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত আছে -

'জেমো কান্দী মহাস্থান
পেটে ভাত নাই মুখে পান।'

এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে থেকে পাওয়া আর কয়েক টি ছড়া -

১) 'বাবুতো লালা আর সব শালা'
২) 'গোকর্ণে কে কার মেসো'
৩) 'বাহাদুরপুরের লাঠি, কুলির ঘাটি, আখড়াই দীঘির মাটি'

লৌকিক দেব-দেবী ও মেলা উৎসব ঃ কান্দী মহকুমার জুড়ে হিন্দু - মুসলিম, আদিবাসী ও ব্রাত্যজনদের মধ্যে নানা রকম ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্যানুষ্ঠান সারা বছর জুড়ে চলে। খড়গ্রাম থানার গু(লিয়া, মহিষার ও কলগ্রামে ধর্মরাজ পুজো উপলক্ষ্যে বাৎসরিক মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জয়পুর গ্রামে হয় সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম্যদেবীর বাৎসরিক পূজা ও মেলা। কান্দীতে রুদ্রদেবের গাজন উপলক্ষ্যে রুদ্রদেবের মন্দিরে হয় বোলান গান ও গাজন নৃত্য, মড়া খেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠান। রুদ্রদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে বসে বিরাট মেলা। গাজন উপলক্ষ্যে রুদ্রদেবকে নিয়ে হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। কানা ময়ূরাক্ষীর তীরে বিশেষ পূজা ও নানাবিধ কৃত্যানুষ্ঠান হয় এবং এখানেও মেলা বসে। এই মেলা একটি প্রাচীন ও বৃহৎ মেলা। দুর্গাপূজার পরের চর্তুদশী তিথিতে দোহালিয়া দক্ষিণাকালী তলায় বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। এই মেলা চতুর্দশী মেলা নামে খ্যাত। এখানে পঞ্চমুণ্ডী আসনে এবং রামকৃষ্ণ আশ্রমে বছরের বিভিন্ন সময়ে উৎসব উপলক্ষ্যে কবিগান, বাউলগান, কীর্তন গান ও যাত্রানুষ্ঠান হয়ে থাকে। নগর গ্রামে ২০শে পৌষ থেকে প্রায় মাসব্যাপী হয় দাদাপীরের মেলা। খড়গ্রামে চৈত্র মাসে হয় গাজনের মেলা। কলগ্রামে শ্রাবণ মাসে হয় ক্ষেত্রপালের পূজা। গাঁতলা গ্রামে সৈয়দ হুসেন পীরের মেলা। কান্দীর সন্নিকটে বোয়ালিয়া গ্রামে চৈত্রমাসে হয় দাদাপীরের উৎসব ও মেলা। মহাদেববাটী মৌজাভুক্ত পাঁচথুপি সংলগ্ন বারকোনার বৌদ্ধস্তুপে হয় চড়কের মেলা। এখানে কয়েক বছর ধরে বাসন্তী পুজা উপলক্ষ্যেও বিরাট উৎসব ও মেলা বসছে। ইন্দ্র দ্বাদশীর দিনে পাঁচথুপি, কামদেববাটী এবং জেমো গ্রামে উৎসব ও ছোট আকারের মেলা বসে। এই উপলক্ষ্যে সাপের খেলা দেখানোর রেওয়াজ আছে। কান্দী, জজান, যশোহরি, পাঁচথুপি, আন্দুলিয়া, জিয়াদারা , রূপপুর ও বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে চৈত্রের গাজন উপলক্ষ্যে বিশেষ সমারোহ, ভক্ত নাচ, মড়ার মাথা খেলানো, আগুন ঝাঁপ, বোলান, পাঁচালী গান ও সংগান প্রভৃতি হয়ে থাকে। হরিশচন্দ্রপুরে জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজ পুজো উপলক্ষ্যে উৎসব ও মেলা হয়। এ সময় কবিগান, পুতুলনাচ, সংগান, বাউলগান ও যাত্রানুষ্ঠান হয়। রূপপুরে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে রুদ্রদেবের মন্দিরে বিশেষ সমারোহ হয়। বড়ঞা, যুগ(রো, পাঁচথুপি, দক্ষিণখণ্ড, জাগুলিয়া প্রভৃতি গ্রামেও বিশেষ সমারোহ ও মেলা বসে। কয়েক বছর ধরে কান্দী পাখমারাডোবে মাঘ মাস জুড়ে হয় বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী। এই উপলক্ষ্যে কীর্তন গান, বাউল গান, কবি গান ও যাত্রা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চন্দ্রসিংহবাটী গ্রামে ভবাপাগলার

আশ্রমে বাৎসরিক স্মরণ অনুষ্ঠানে জনসমাগম হয়। বড়ঞা গ্রাম সংলগ্ন আলমপীরের দরগায় ফাল্গুন মাসে হয় বিশেষ উৎসব। সাহোরা গ্রামে সঙ্কটেশ্বরী নামে লৌকিক কালী পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং মেলা বসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গোলাহাট গ্রামে জয়মঙ্গলা দেবীর বাৎসরিক উৎসব ও মেলা হয়। ঝিকরহাটি, ছোটকাপসা, বড় কাপসা, রাজহাট গ্রামে ভাদ্র মাসে মনসা দেবীর বিশেষ পূজা, মনসার গান ও মেলা হয়। পাঁচথুপি, মালিয়ান্দি, ভাস্তর, হাপিনা, প্রভৃতি গ্রামে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে বিশেষ পুজা হয়। কামদেববাটীতে হয় বাৎসরিক মনসার উৎসব। মহাদেববাটী মালিয়ান্দি গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা বসে। চৈতপুর ও দক্ষিণখণ্ড গ্রামে শীতকালে মেলা বসে। এবং এই মেলায় কবিগান, বাউল গান, যাত্রা গান, আলকাপ গান ও কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচথুপি সংলগ্ন বিখ্যাত কেশেরপাড়ের মেলায় এক সময় ঝুমুর নাচ ও আলকাপ গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু সে মেলা আজ আর হয় না। কুলি গ্রামে চৈত্র মাসে হয় পীর সাহেবের উৎসব ও মেলা। একঘড়িয়া গ্রামেও পীর সাহেবের স্মরণে বাৎসরিক উৎসব ও মেলা বসে। সাহোরা ও সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় ধর্মরাজের বিশেষ পূজা ও উৎসব। এই উপলক্ষে বোলান ও পাঁচালী গান পরিবেশিত হয়। কালিকাপুর ব্রহ্মময়ী মায়ের বাৎসরিক উৎসব ও মেলা হয় মাঘ মাসে। ভরতপুর গ্রামে গদাধরের শ্রীপাটে বৈশাখ মাসে বাৎসরিক স্মরণ উৎসব ও কীর্তন গান হয়। মালিহাটি গ্রামে আছে মহারাজ নন্দকুমারের গুরু ও পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপাট। এখানে চৈত্রমাসে কয়েকদিন ব্যাপী কীর্তন, বাউল, কবিগান, পরিবেশিত হয় ও মেলা বসে। বিন্দারপুর, জজান ও শক্তিপুরে বৈশাখ মাসে বাৎসরিক উৎসবে বাউল, কীর্তন, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং মেলা বসে। শক্তিপুরে ক্ষ্যাপা বাবার বাড়ীতে জজানে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে এবং বিন্দারপুরে গ্রাম রক্ষাকালী দেবী ও শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে বিশেষ পূজা উপলক্ষে বিপুল জনসমাগম হয় ও মেলা বসে। তালিবপুরে ফাল্গুন মাসে হয় হজরত পীরের বাৎসরিক উরস। সালার গ্রামে দক্ষিণে একটি পীরের আস্তানায় বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং মেলা বসে। জাউলিয়া, কড়েয়া, ভরতপুর, জজান, কান্দী, গোপগ্রাম, তালিবপুর, পাঁচথুপি প্রভৃতি গ্রামে চৈত্রমাসের শেষ কটা দিনে গাজনের উৎসবে গ্রাম সমাজে ব্রাত্য জনগোষ্ঠী উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠেন। পাঁচথুপি এবং কান্দীতে একসময় ঝুলন যাত্রায় খুব রমরমা ছিল। কান্দীতে রাধাবল্লভের মন্দির সংলগ্ন কৃষ্ণসাগরের হরিমতি বাঈজীর নাচ বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। কান্দীতে রাধাবল্লভের বাড়ীতে রথযাত্রায় মেলা বসে। রাসেও এখানে অনেক জনসমাগম হয়। পাঁচথুপিতে দুর্গাপূজা, কাগ্রামে জগদ্ধাত্রীপূজা, এড়োয়ালী ও গোকর্ণের কালীপূজা এই অঞ্চলের বিশেষ দর্শনীয় উৎসব। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে রাধাগোবিন্দ জিউর বাৎসরিক উৎসব হয় মাঘ মাসে। শক্তিপুর গ্রামে কপিলেশ্বরের শিব, শিশুয়া গ্রামে শিশুয়েশ্বরের শিবের বাৎসরিক মেলা উৎসব হয় চৈত্রমাসে। আলুগ্রামে কোপাই নদীর তীরে হয় চড়কের মেলা। রথযাত্রা উপলক্ষে সংগানের চল আছে। চৈত্রের শেষ কটা দিনে গাজনের উৎসবে কান্দী অঞ্চল মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

লৌকিক চিকিৎসা ঃ বহুপ্রাচীন কাল থেকে মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি পরিবারে পুরুষ ও মহিলাগণ পুরুষানুক্রমে লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। ছোট খাটো রোগ বালাই কাটা ছেঁড়ায় তাদের জানা ভেষজ ঔষধ প্রয়োগ করতেন। তুলসীপাতা, বেলপাতা, গাঁদালের পাতা, অর্জুনের ছাল, ত্রিফলার জল, দূর্বাঘাস, জষ্ঠিমধু, গাঁদার পাতা, পাথরকুচির পাতা ও নানাবিধ শিকড়বাকড়ের রস রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হ'ত। সে কালে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সুযোগ ছিল না। পারিবারিক লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়া গ্রাম্য ওঝা, ফকির, মন্দিরের দেয়াসী ও গ্রাম্য কবিরাজ বৃন্দ ঝাড়ফুঁক মন্ত্র তন্ত্রের আস্তরণে বহু পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, জড়িবুটি, গাছ গাছালির ভেষজ গুণের দ্বারা রোগ নিরাময় করতে পারতেন। সাধারণ মানুষ বিপদকালে ছুটে যেতেন ও উপকার পেতেন। কিন্তু শিষ্য ও বংশ পরম্পরায় এই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে গোপন রাখা হ'ত। অনেক অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্রচলিত লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতি যথাযথ আয়ত্ব না করে বুজরুকির আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তার ফলে চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটত এবং গ্রামের মানুষ দিন দিন এদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলতেন। কিন্তু এখনও গ্রাম সমাজে অনেক মানুষ সাপে কাটা, শিয়াল কুকুরের কামড়ানো, বসন্ত রোগ, পেটের অসুখ, চর্ম রোগ, মনোবিকলন, রক্তক্ষরণ, হাড়ভাঙ্গা, শিশু ও নারীদের নানাবিধ রোগের জন্য ফকিরের আস্তানা, গ্রাম্য দেবদেবী, দেয়াসী ও গ্রাম্য ওঝার কাছে ছুটে যান। হাত - পা ভাঙলে চলে যান কাটনা গ্রামে, চোখের রোগে যান দক্ষিণা কালী তলায় অঞ্জন নিতে। কুকুরে কামড়ালে যান রুদ্রদেবের মন্দিরে ঔষধ খেতে। বন্ধ্যা রমণীরা সন্তান কামনায় ছুটে যান মুটুকেশ্বরের মন্দিরে। বলা বাহুল্য, উন্নত শিক্ষা প্রসার ও চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক সুযোগের ফলে এসবের প্রতি নির্ভরতা দ্রুত কমে আসছে।

লৌকিক ক্রীড়া ঃ শত শত বছর ধরে গ্রামের শিশু, বালক ও যুবক ছেলেমেয়েরা লৌকিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও মানসিক স্ফূর্তি লাভ করতেন। বাল্যকালে প্রচলিত লৌকিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন ছড়ার আবৃত্তির ফলে এই ক্রীড়াগুলি শিশুদের কাছে বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। পুতুল খেলা,

লুকোচুরি, দৌড়াদৌড়ি, সাঁতার কাটা, গাছে ওঠা, চোর পুলিশ খেলা, জল কুমীর খেলা, দোলনায় ঝোলা, ডাঙ্গুলী খেলা, হাডুডু খেলা, ষোল গুটি খেলা, বাঘবন্দী খেলা, কানামাছি খেলা, জল ডিঙ্গা ডিঙ্গি খেলা একসময় গ্রাম্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। লাঠিখেলা ও কুস্তির লড়াই এ অঞ্চলে এখনো বেশ জনপ্রিয়।

পরিচয় পর্বঃ

মুর্শিদাবাদ জেলায় হাজার বছর ধরে লোক সংস্কৃতির বহু বিস্তৃত ধারা উপধারায় বহমান পূজা পার্বন, মেলা - উৎসবের মধ্যে দিয়ে লোক সমাজের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। সঙ্গীত নৃত্য, বাদ্য, নাট্য, শিল্পচর্চা প্রভৃতি আঙ্গিকগুলি ধারাবাহিক সৃজনশীলতারই প্রকাশ। তারই কিছু নমুনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিগত কয়েক দশক ধরে আহরণ করে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে -

গাড়োলি সম্প্রদায়ের গান

আরে হোলি খেলে সদাশিব আরে জটাসে,
আরে শিবা জটাসে বিরাজেতু গং।
আরে হোলি খেলে সদাশিব আরে জটাসে,
আরে শিবা জটাসে বিরাজেতু গং।
ভাঙ্গধুতরা পরা শেবা মগনাতাই
ভাঙ্গধুতরা পরা হেরে আহারে
ভাঙ্গধুতরা পরা শেবা মনসা
উই গৌরী সে তে গৌরী ভগবতিক

মুশাহার জনগোষ্ঠীর গান

নেগোরে মাদোলে বোলে তুরি, ভগবানের লাগাল দিলি জুরি,
সীতা মলে সীতা পাবো, ভাই মলে কোথা পাবো,
এসো ভাই কোলের উপরে, সীতা কাঁদে স(ডাল ধরে,
সীতা মলে সীতা পাবো, ভাই মলে কোথা পাবে।

বিন্দ জনগোষ্ঠীর গান

নদী রালে তীরে তীরে বসলে মে,
সোনিকে মৃগাওয়া চরি, চরি যাই হে।
ছটি মাহই। কাথি কেরা তীর হে
শোনে ধনুকা হে - কাথি কেরা তীর হে,
শোনে ধনুকা হে, রূপে কেয়া তার হে।
কউন ভাই মারলেন ধনুকা, চালাহ হৈ ছটি মাই।
উরজ ভাইয়া মারে বসন্ত, ধনুকা চালাহ হৈ ছটি মাই।
হে রইন জেতলে আবেলন চাঁদা দাই কে ভাই হে ছটি মাই।

মাল পাহাড়ীদের গান (বিয়ের গান)

একথা কুন মাটি কেয়া বনে বাঁধ বানাইগো
সমদ্রের পানি বা, ঢেও এ পা ভাঙিল।
ছুটয়া দেওরা মেরিচি কেনিয়া বাঁধি ভাতা না খায়,
গরম ভাতে পাঙ্খা দুলুনিয়া বুনেরে বুনে বাঁশিরে বাজায়।

মগ জনগোষ্ঠীর গান

কাহা বীর বোলা, কাহার কারি কোরী নায়া,
কেয়া দিয়া বোধ হাউরে, কারি কোওয়ালা আরে।
কুলে কুলা বোধ আউরে কাঠির কোওয়া লিয়ারে।
দুটা ভাত বৌ আউরে কারি কোরি কায়া রে।

ওঁরাও জনগোষ্ঠীর গান

বিবাহ সঙ্গীত

আনার বানার বালটি চেহাই ডাণ্ডিগো পাটি,
বাবাই কই বাবাই চেএ(াই ডাণ্ডিগো পাটি।

করম গান

যাওয়া যাওয়া জাগুর মাকুন দারি মারি যাওয়া হাওয়া।
রশুন দাড়ি মাই খাওয়া
মাইলা গান বাবুন, লাখান হারা উল্লা যাওয়া
জাগুর মাকুম দারিমাই যাওয়া

অর্থঃ তোমার অধম ছেলে আমরা, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করো। তোমাকে আমরা পূজা করতে বসেছি।

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর গান

সাঁওতাল বিদ্রোহের গান (১৮৫৫ - ৫৭)

হুল! হুল! দিশমরে চার ওয়াকে আসন বো।
দারগা বানুক কৌয়া, হাকিম বানুক কৌয়া, সরকার বামু গেরা।
সিতঃক দহড্ হপন রেয়াংক্ রাজ হেচ সেটের এনা

বিয়ের গান

(১)

(বড়এ(া থানার কুণ্ডল গ্রাম থেকে সংগৃহীত)

আখুয়া আখুয়া হেথো হা হা হা হা,
চিবা হরি বোল, আহা কাম্ কাম্ বালকাম্ আন্টা
ডান্ডি ডান্ডি পরিবোন বাবাই ফই বারাই
সামাদা আন্টা ডান্ডি পারকান।

(২)

(কর্ণসুবর্ণ চাতরা থেকে সংগৃহীত)

সান্তাল দি মোন সান্তাল হরো সান্তাল সমাজ,
গরলরে বন তাহে কান,
ননতু রিমিল বিতান বিবিন পাড়ায়া ফল
হেন্দে রেমিন রে বন, হাড় হাও আকারে।

ধাঁধা বা হেয়ালী

(জেমো গ্রামের দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় সংগৃহীত)

১) হাত নেই তার, পা নাই তার, নাই কো দুটা কান,
নালায় নালায় বেড়াই আমার না(য়ো সন্তান
(উত্তর ঃ কেঁচো)
২) এক থালা সুপারী, গুনতে নারি ব্যাপারী
(উত্তর ঃ নক্ষত্র)
৩) পেটে খায়, পিঠে হাঁটে (উত্তর ঃ নৌকা)

প্রবাদ

১) তাল বেল কুল, ভাতের উপর শূল।
২) মা গুনে বিটি, লই গুনে রুটি।
৩) কায়েত মলে জলে ভাসে, কাক বলে কোন ছলে আছে।
৪) কায়েত কৃপন বেনে দাতা, হতেই হবে জার জাতা।
৫) দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা, পূর্ব দুয়ারী তাহার প্রজা
পশ্চিম দুয়ারী সদাই তাপ, উত্তর দুয়ারী ঘরের পাপ

মেয়েলী প্রবাদ

(লক্ষ্মীরাণী ঘোষ — জজান)

(১)

গেরস্থ ঃ কালো বেড়াল দধি মুখী,
তুই থাকতে কেন দুখী
বেড়াল ঃ তাল তেতুল বাবলা
কি করব আমি একলা।

(২)

পরগা বিটি পরগা, উত্তরেতে পরগা
ভাত কাপড়ের দুখ নাই, ধান সিজিয়ে মরগা,
পরগা বিটি পরগা ফতে সিংহে পরগা
ভাত কাপড়ের দুখ নাই, কথার জ্বালায় মরগা।

প্রবচন

(১)

মহিষের শিং, গরুর শিং, তাকে বলে কি শিং
শিং - এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেওয়ান গঙ্গা - গোবিন্দ শিং

(২)

সাহাপুরের লুঙ্গী, মালিহাটির হাড়ি,
চোঁয়া তোরের টাঙ্গি, উজুনিয়ার দাড়ি।
পাঁচথুপীর খোঁপা, জজানের দিদি ঠাকরুণ,
টেঁয়ার চোঁপা, বদ্দিপুরের বৌঠাকরুণ।

(৩)

সয়দাবাদের ময়দা, কাশিমবাজারের ঘি,
তিলেক দাঁড়াও জামাই, লুচি ভেজে দিই।

ওঝার ঝাড়ন মন্ত্র

মা আপনার নিজ মন্ত্র করিলাম প্রচার,
পৃথিবী মণ্ডলে মাগো তোমারই প্রচার,
তুমি যদি তরাও মাগো তবে আমি তরী,
কাহারও শক্তি নাই গো, রাখি বারে পারে।
যবনের রাজা ছিলেন, হোসেন আর হাসান বধিলেন তারে,
হোসেন আর হাসান ধরেন কমলার পায়ে,
মা মনসার শরন লেগে বিষ ছাড়িয়া পালায়,
ও বিষ ছাড়িয়া পালায়।
কার আজ্ঞে, কামরূপ-কামাক্ষার আজ্ঞে মা, মনসার আজ্ঞে।

ব্রতকথা ও ব্রতের ছড়া

**(ইন্দুমতী দেবীর সংগৃহীত প্রায় শত বৎসর আগে
রাঢ় - মুর্শিদাবাদের প্রচলিত ব্রত কথা)**

শ্রী শ্রী শঙ্কর মঙ্গলচণ্ডীর কথা —

প্রভাতে কুমারী কন্যা, কুচকেলি বালা,
ধর্ম সাক্ষী মায়ের জপের মালা।
জপ তপ করো কি মা,
হরের মায়ায় আপনি তো মহামায়া,
পদ্মের আসন, পরিধান পট্টবস্ত্র, গলে মুণ্ড মালা,
সন্ধ্যা কালে নামিলেন মা হয়ে বিষহারা।
যেবা শুনে যেবা কয়, তারে করো, পার,
সঙ্কট হইতে উদ্ধার করো মা, সঙ্কট মঙ্গলবার

শ্রী শ্রী বারমাস শুভ মঙ্গলচণ্ডীর কথা—

সোনার মা মঙ্গলচণ্ডী বারি। কেন মা মঙ্গলচন্ডী এত দেরী।
মঙ্গলচণ্ডী আসছেন হুক্‌রোতে দুক্‌রোতে পুজো কুলুপ ভাঙতে।
নির্ধনকে ধন দিতে, আইবুড়ো খালাস করতে।
অন্ধকে চক্ষু দিতে, দূরের মানুষ নিকটে আনতে,
দুই ঠাইকার মানুষ এক ঠাই করতে,
শত্রুর ক্ষয় করতে, মিত্রের জয় করতে,
আসছেন মা মহেশ্বরী, দেওয়ানে দরবারে জয় যুক্ত করতে।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত স্বদেশী ব্রত কথা

(বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তাঁর জেমোর ঠাকুর বাড়ীতে মহিলাদের জমায়েতে পঠিত)

বাংলাদেশ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। গঙ্গা পূর্ব বাহিতা হয়ে প্রবেশ করে সাত মুখী হয়ে সাগরে প্রবেশ করলেন। বাংলার লক্ষ্মী, বাংলাদেশ জুড়ে বসলো। ফল, ফুল শতদল, রাজহংস, গোলা ভরা ধান, গোয়ালে গরু, গাল ভরা হাসি বিরাজ করত। লোকে পরম সুখে বাস করত। এমন সময় মত্তকালীর উদয়। লোকে ধর্ম কর্ম, বেদ - বিধি ছেড়ে অনাচারী হ'ল। লক্ষ্মী চঞ্চলা হলেন। রাজা তখন আদি শূর। সে সময় কণৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পাঁচ জন সজ্জন কায়স্থ এলেন। পুনরায় লক্ষ্মী জুড়ে বসলেন। ধন - ধান্যে দেশ পূর্ণ হ'ল। লক্ষ্মণ সেনের আমলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হলেন। তার রাজ্য গেল, মুসলমান বাংলার রাজা হ'ল। হিন্দু জাতির ধর্ম নষ্ট হ'ল। হিন্দু মুসলমান হানাহানি, কাটাকাটি করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা হলেন। তখন গৌড়ে পাঠান বাদশাহ, দিল্লীতে মোঘল বাদশাহ। বাদশার রাজত্বে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি হ'ল। মুসলমান রাজা হিন্দু ব্রাহ্মণকে রাজমন্ত্রী করলেন। এমন সময় নদীয়া বাংলার লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বসল।

বিবিধ ছড়া

নবান্নের ছড়া

নতুন বস্ত্র, পুরানো অন্ন, খায় পরি যেন জন্ম জন্ম ।
স্বর্গে দেবগণ, মর্তে নরগণ, পাতালে বাসুকী,
তিনলোক সাক্ষী, নপুরোনো নারছি।

কন্যা পণের স্মৃতি

আলুপাতা আলু থালু, মাংস পাতার ঝোল,
সকল জামাই খেয়ে গেল, ছোট জামাই কই?
ঐ আসছে ছোট জামাই গামছা মুড়ি দিয়ে,
ও গামছা নেবো না, মেয়ের বিয়ে দেবো না,
মেয়ে দেবো সাজিয়ে, টাকা নেবো বাজিয়ে।

হাপুর ছড়া

বুড়ো যায় মাছ ধরতে, শুধু আনে পুঁটি,
দুই সতীনে ঝগড়া করে, ধরলো বুড়োর টুটি।
বুড়ো যায় মাছ ধরতে, ধরে আনে ব্যাঙ,
এবার দুই সতীনে ঝগড়া করে ধরে বুড়োর ঠ্যাং।
আবার বুড়ো গেল মাছ ধরতে, মেখে এল কাদা
দুই সতীনে হ্যাঁচকা মেরে, বলল বুড়ো গাধা।

মেলিনী মাসির ছড়া

মা মেলিনী মা মেলিনী, থমকা ফেলে পা,
আমার ঘাটে লা লাগিয়ে, শাড়ি পড়তে যাও।
কিবা শাড়ি পরাবো আমি, আইবুড়ো কুমারী,
আমার শাড়ি তোলা আছে দোকানী ভাইয়ের বাড়ী।
মা মেলিনী মা মেলিনী, থমকা ফেলে পা,
আমার ঘাটে লা লাগিয়ে ব্লাউজ পরে যাও।
কিবা ব্লাউজ পরাবো আমি, আইবুড়ো কুমারী,
আমার ব্লাউজ তোলা আছে দোকানী ভাইয়ের বাড়ী।

ছাদ পেটানোর ছড়া

বধুঁর বাড়ী আমার বাড়ী মাঝে নীলের বেড়া,
হাতে হাতে পান দিতে, দেখলো দেওর ছোড়া,
সজনে গাছে গাব গোবাগুব, কুলু ছুড়ির বিয়ে,
মামা আমার পান খেয়েছে, শাশুড়ী বাধা দিয়ে,
লাগ লাগ লাগ লাগলো মজা, লাগলো নতুন হাটে।

চণ্ডীপুজোর প্রাচীন পাঁচালী

(নবগ্রাম থানার পমীয়া গ্রাম থেকে শ্রী যমুনা প্রসাদ মণ্ডল সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি থেকে)

শ্রী শ্রী চণ্ডী মাতায়ো নমঃ

প্রহরা

দেউরে হরির ধবনী, দেউ জড়ো করো।
মা গঙ্গার চরণ বন্দ, হরিতে ভকতি।
গঙ্গা দেবীর চরণ বন্দ দেবী সরস্বতী।
এ সময় সরস্বতী মোর কণ্ঠে বলো,
মেলা ভাই ফুল গাঁথে, পাঁচালী জুড়ো বসো।
মেলা ভাই ফুল গাঁথে, কোঁন্দের কান্দালী
কি দিয়ে চালাবো সাঁই পেটেলীর গুরী।

নং ব্যাঙ নরে ফিরে, কোনা ব্যাঙ নরে,
পিঠের মাংস খান খান মাঘ মাসের জারে।
নরেং না নরেং তাকে চাপরে মারো,
হংসের আগাম নয়, ফুলের কেদার।
এসোরে ভকত ভাই, জেয়ের মণ্ডলে যায়,
জেয়ের মণ্ডলে যেতে কি কি নিয়ম চায়।
লয়া হাড়ি তিল, আলো চাল, এটে কলার পাত,
সারাদিন না লেগে, পরে ভোল ভোলী শহর।
তৃতীয় দিবসে সমজম করি, চতুর্থ দিবসে হবিস করি,
এক হবিস এক নয়। পঞ্চম দিবসে ফল আহার করি,
ষষ্ঠী দিবসে উপবাস করি, সপ্ত দিবসে সমস্যা পূরণ।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী

(ভরতপুর থানার আলুগ্রামের জনার্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রচিত পুঁথী থেকে)

বন্দনা

জননীর পাদ পদ্ম করিয়া স্মরণ, পাঁচালী প্রবন্ধে গায় দ্বিজ জনার্দন।
মনে করি অভিলাস, দশ দিন দশ মাস,
জিহো মোরে গড়িলা উদরে, সেই পদে বন্ধি সকাতরে।
আখ্যা দ্বিজ জনার্দন সত্যের পাঁচালী কন, হৃদে ভাবি মায়ের চরণ।

পটের গান

যম পটের গান

রবির পুত্র যম রাজা ধর্ম নাম ধরে,
বিনা অপরাধে পাপীদের দণ্ড নাহি করে।
কালদূত ও বিষ্ণুদূত যমের প্রহরি,
যাকে যখন হুকুম করে, তারে করে ঘাড়ী।
একজনা বলিতে ওরা দুই জনে যায়,
কেওবা ধরে চুলের মুঠি, কেউ বা দেখায় ভয়।
চিত্রগুপ্ত মহরী তার, দিবা - রাত্র লেখে,
যার যেমন কপালের ফল, এরা দুজন দেখে।
দেবতার ফল যে জন চুরী করে খায়,
তপ্ত শাড়াশী করে তার জিহ্বা টেনে নেয়।
নিজের পতি থাকতে যে জন পরে পতিতে ধায়,
খেজুর গাছে উলঙ্গ করে তাহাকে ছেচরায়।.....
... জগন্নাথের পুরীতে মা জাতীর বিচার নাই,
শুদ্র দেয় প্রসাদ সকল জনে খায়

জারি গান

আলিজির মহলে ছিল যত বিবিগণ,
ঘোড়ার গলা ধরে সবে জুরিল কাঁদন,
শুনরে দুলদুলি ঘোড়া, শুনতো মেরিয়া,
আজ হতে হওগা দুলদুলি ইমামনের জননী।
ভোখলা - গিলে দিও খান, পিয়াসে দিও পানি।
ছুটে গিয়ে খবর দিল, এজিদ এরও সামনে,
হজরত আলির বেটা ইমাম আইল রণে।
দুতি মুখে শুনে এজিদ এসাই খবর,
কোমর বেঁধে খাড়া হলো, ষাট হাজার লস্কর .... ইত্যাদি

পটুয়া মেয়েদের বিয়ের গান

কেন গেলাম জলের ঘাটে, জল ভরা সই হলো না,
-পুরে* নিতুই বাজে শ্যামের বাঁশি, আর কেন বাঁশি বাজে না।
জলভরা তোর হলো না রে, ডুবে কলসি উঠল না
শাড়ি পরা আর হলো না তোর, সায়া পরা হলো না।
সাবান মাখা হলো না তোর, মাথা ঘসা হলো না।
সেমিজ পরা হলো না তোর, ব্লাউজ পরা হলো না।
কেন গেলাম জলের ঘাটে, জল ভরা সই হলো না।

*(মুর্শিদাবাদ থানার প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভুক্ত গোকুলপুর গ্রাম)

প্রহেলী পাঁচালী

(১) ওরে আমি আজ অবাক হলাম দেখে,
বনে এক বেড়ে শেয়াল গান ধরেছে মনের সুখে
(২) তান ধরেছে বাঘিনী, হরিণ দেয় রাগিনী
তা দেখে কাল নাগিনী, বসলো গিয়ে বাসায় ঢুকে,
সিংহের মামা ভম্বল এল, দগরে রগর লাগালো,
খ্যাঁক শেয়ালী কাজ বাগালো, নিতাই নিতাই বলছে মুখে।

সত্যপীরের পাঁচালী

ঠাকুর তোমারই নামেতে সত্যপীর সত্যনারায়ণ
একই যে কথা, আর গুনেতে আছে মাগো, পাঁচু রায়ের স্থান।
তাঁহার মানসিক করে দরিয়ার কুম্ভির,
জলের ভেতর থাকো প্রভু, বাকসের ভেতরে পোরা,
জীবের ভেতর গিরের গোলা, তার মেলেছে লতা।
ঠাকুর তোমারই নামেতে।
ঘেরো ঘেরো ঘেরো ঠাকুর, ঘেরো বৃন্দাবন,
বৃন্দাবন ঘেরিলে পাবে কৃষ্ণ দরশন।
অতিথি ফকিরকে দেখে যে করিবে হেলা,
বৈকুণ্ঠের দিনে তারে ভুলে যাব ভোলা

ভাঁজো গান (গীত)

(ভরতপুর থানার বিন্দারপুর গ্রাম থেকে শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ও শ্রীমতি লতিকা ঘোষের কাছে থেকে সংগৃহীত)

ভাঁজোইলো সুন্দরী, মাটিলো সড়া,
কাল ভাঁজো কে নিয়ে যাবে, ঐ নদীর গাবা।
ও পাড়ার ভাঁজোই গুলো গ(তে খেয়ে নেয়,
আমাদের ভাঁজোই সোনার বরণ পায় ....
একদিনের ভাঁজো আমার, দুয়ে দিলেন পা,
তবুও সোনার ভাঁজো গা তোলে না।
গা তোলো গা তোলো ভাঁজো, বসতে দিব শিতল পাটি,
খেতে দেবো ননি, জন্ম সফল হোক, মা বলো তুমি।

মুসলিম বিয়ের গীত (গান)

(১)
আমার মা বলেছে বিহা দিবোরে,
বহরমপুরের মাঠে গ(চরাবোরে।
আমার মা বুলেছে ভাই দামুদরে,
তাই রে নাইরে না।
আমার মা বুলেছে বুকে বুকে ভিরিয়ে শুবোরে,
আমার মুখের পানে করা করা মোচ্‌রে,
আমার ফালা ফালা চোখরে,
আমি বুকে বুক লাগিয়ে চুমা খাবোরে,
আমি বাদশা দামুদ পেলামরে।

(২)
মালা বেচব বাজারে গিয়ে এমনি দিব না
ধারে দিব নারে মালা এমনি দিব না,
মনের মত মানুষ পেলে পয়সা নেব না
মনের মত বন্ধু পেলে পয়সা নেব না
মালা বেচব বাজারে গিয়ে পয়সা নেব না।

রামায়ণ গান

(বড়এ(া থানার কল্যাণপুর গ্রামের অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিবেশিত)

রাম একবার আসতে হবে হে।
জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলমণি,
কৃপা করি এসো প্রভু জগৎ চিন্তামণি।
কোথা কারে আছো প্রভু নিশ্চিন্ত বসিয়ে ,
আমার আসরে এসো অযোধ্যা ছাড়িয়া,
একবার আসতে হবে হে। ।
সর্ব অগ্রে বন্দি গজানন,
একদন্তী বিঘ্ন নাশ গৌরীর নন্দন।
তার পরে বন্দি ভানু উদয় পর্বতে ,
গ্রহ, তারা রাশি ছাড়া সন্ধ্যার সহিতে।
হংসে ব্রহ্ম বন্দীব গড়ুরে নারায়ণ,
পার্বতী সহিত বন্দী ভোলা পঞ্চানন।
বন্দী রাজা দশরথ অযোধ্যা নগরে,
এক অংশে চারি অংশ, হইলেন যার ঘরে।
কৌশল্যার তুল্য কেবা আছেন ভাগ্যবতী,
যার দুগ্ধ পান করিলেন অখিলের পতি।
মহামুণি বাল্মীকির বন্দি শ্রীচরণ,
যিনি রচিলেন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।
মহামুণি লিখিলেন (্লোক অনুসারে,
কৃত্তিবাস বোঝালেন লিখিয়া পয়ারে।

ভাদু গান

(১)
ভাদু জাসনে পাড়া বেড়াতে নিশিথে,
ভাদু আমার মান করেছে, কি দিয়ে মান ভাঙ্গাবো
আঁধার ঘরে বাতি জ্বেলে গো, আমি জোড় হাত করে দাঁড়াবো।
ভাদু জাসনে পাড়া বেড়াতে নিশিথে।
ভাদু আমার ছোট মেয়ে গো, কে পাঠালে কোলকাতা,
কোলকাতার ঐ লোনা জলে ভাদু হলো শ্যামলতা।
ভাদু জাসনে পাড়া বেড়াতে নিশিথে।
ভাদুর আমার বিয়ে দেবো গো, স্টেশন এর ঐ বাবুকে,
দেখতে আসতে ভালো হবে, চড়বে রেলে গাড়িতে,
ভাদু জাসনে পাড়া বেড়াতে নিশিথে,
ভাদুর জামাই দ(িণে যাবে গো, ভাদু দিল আধুলি,
আমার লেগে এনো তুমি তখমা আটা মাদুলি।

(২)

ভাদু আমার কলেজ যাবে গো, পড়াতে তার ঝোঁক ভারি,
খাতাকলমের ধার ধারে না, ডান হাতে বাঁধা ঘড়ি।
ভাদু খেতে ভালোবাসেগো কচি শশা আর গরম মুড়ি।
পাল পার্বণের লুচিপুরি গো, বাদলা দিনে খিচুরী।
ভাদুকে নিয়ে এলাম গো মৌরা(ী পারে বাড়ি।
এই খানেতে সাঙ্গ করি বদনে বলুন হরি।

সং গান

চারজন লোককে যমদূত যমের বাড়ি নিয়ে গিয়েছে,
যমের দরবারে তারা আত্ম পরিচয় দিচ্ছে --

প্রথমজন -
আমার দেখে করণ কারণ, লোকে শালা ছাড়া বলতো না,
লোকের ভুয়ের কুমড়ো পটল, তুলতে ছাড়তাম না
দ্বিতীয়জন -
ধর্ম পথে থাকতাম তবু, লোকে বলত দেবো নর বলি।
মেয়ে দেখলে ছোঁ ছোঁ করে মন, কলির কেষ্ট বলি।
তৃতীয়জন -
হে ধর্মরাজ, ধর্মে দেহ পরিপূর্ণ, তবু শকুনে ছুলো না,
চুরির বামাল সামাল দিতাম তাইতে গঙ্গা হলো না।
চতুর্থজন-
আমি বড় বৈষ্ণব ভক্ত, তিন মকারের ভক্ত একজনা,
ডুবে ডুবে জল খায়, ভূতের বাবা জানে না।

শীতলার গান

ছামাল রূপে বসন্ত মা, নগরে বেড়াই,
মার হাতে ঝাঁটা, মাথায় কুলো, কাকলে কলসী,
ঘন ঘন নেয় মাংস তাতালে সারথী।
তুমি মাগো সবারের মা, তুমি মাগো কে,
মরিয়া না মরে বাছা, নামটি জপে যে।
গৌর রূপ স্মরণে মা, পাপ যে খণ্ডায়,
সুবর্ণ পৈতে গলে মা, বসন্ত মজায়।

আলকাপ গানে ১৩৪৬ - এর জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের স্মৃতি

১৩৪৬ সালে উঠল কঠিন ঝড়, ছিল নাকো ঘর
ওরে ভাই ঝড়ে থাকতে পারি না ঘরে, ছিল নাকো ঘর,
বুধবারের ঐ হাটের দিনে ঝড় উঠলো পশ্চিম কোণে,
চর্তুদিকে উঠলো ধুলি হয়ে অন্ধকার, ছিল নাকো ঘর।
ফুলের গাছে ভাঙ্গা ডালা, উড়ে গেল গাড়োয়ানের ছালা,
জ্যৈষ্ঠমাসের আঁচকা ঝড়ে, কত গরু-ছাগল মানুষ মরে।

বোলান গান

(শতাধিক বছর ধরে প্রচলিত বোলান গানটি কান্দির রুদ্রদেবের মন্দিরে কালকে পাতার ভক্তদের কাছ থেকে সংগৃহীত)

ধুল ধুল সাজলে - ধূল ধূল সাজলে, ধূল ধূল ধূল।
করছে মায়ের পাতা উদম করে চূল, ওরে সাজলে।
শ্মশানে গিয়েছিলাম মশানে গিয়েছিলাম, সঙ্গে গিয়েছিল কে ?
ওরে সাজলে।
সোনার আচির সোনার প্রাচীর, সোনার সিংহাসন,
তার উপর বসে আছেন ধর্ম নিরঞ্জন,
ওরে সাজলে।
কার গাছেতে কেটেছিলাম খণ্ড কলার বাল
আজ পুত্র শোকে আকুল হলাম কে দিলে গাল।
ওরে সাজলে।
জল সুদ্ধ, স্থল সুদ্ধ, সুদ্ধ তামার বাটি,
আড়াই হাত মৃত্তিকা সুদ্ধ ঢাকের কাঠি, ওরে সাজলে।
ভালো বাজালি ঢেকো ভাইয়া, তোর মা আমার দাসী,
এনদ করে বাজা সাজলে, বিনোদ করে নাচি।

কবি গান

(কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে শতাধিক বৎসর আগে মুর্শিদাবাদের তৎকালীন বিশিষ্ট কবিয়াল হোসেন খাঁর সঙ্গে স্বনাম খ্যাত ভোলা ময়রার লড়াই)

জুর জরু জমিন ক্যায়সে খতরে আনে,
খুন্ মুন সুন ক্যায়সে পতরে জানে।
যো ওয়ালা সো ওয়ালা, কালা কেনে ভাই,
হিজিরি কেন হজের সঙ্গে নাই।
জবনে ব্রাহ্মণে বলো কোন ভেদটা দেখি,
ভোলার টাকা সদাই খাঁটি এবার হোসেনের মেকি।

গাজন উপলক্ষে হাবু গান

কে লিবিগো আমার নামলা গাছের কমলা লেবু,
উপরে টিপলে দড়, ভিতরে তার রসের গাবু।
চিরে পাতা পান বাউটা হাতে, আমার বাড়ি তাল তলাতে,
আমার বাড়ি যেও বন্ধু তামাক খাওয়ার বাসনায়।
ঘিচাক্ দুম ঘিচাক্ দুম, কাঁথা পেরে দে মারি ঘুম।
পানটি খেয়ে মুখটি রাখা, ঠোঁটটি রেখো যতনে,
আমার ভাবের বধু দাঁড়িয়ে আছে পান মসলার দোকানে।
ঘিচাক দুম ঘিচাক দুম, কাঁথা পেরে দে মারি ঘুম।

মনসার গান

ধুয়া - লখাইকে দংশিলরে কালনাগিনী
পরধুয়া - নাগ নয় নাগিনী নয়রে মনসা দেবীর খেলা - লখাইরে।
কাল ধূলায় পড়ে যায় গড়া গড়ি। - লখাইরে
নব ডঙ্ক, চিতা ডুগি, কেউটে আর বোরা,
হলহল্লা, ঢ্যামনা সাপ গখুড়া আর ঢোড়া - লখাইরে।
তবে চম্পকধামে চাঁদ সওদাগর
হরগৌরী ভজে বেনে প্রফুল্ল অন্তর।
সনকা নামে সতী তাঁহার ঘরণী, সতীকুল শিরোমণি।
চম্পায় নগরে বাস জগাই ধীবর,
নিছনি নামেতে নারী থাকে তার ঘর।
কানেতে নিছনি লয়ে জমজ ও সন্তান,
ঝালু মালু দুই নাম খ্যাত সব স্থান।
মনসার মূর্তি এক ডোবা ছিল জলে,
ঝালু মালু তোলে তাহা মাছ ধরা জালে।
নিছনি হেরিয়া মূর্তি আনন্দিত হইল,
ভক্তি সহকারে পূজা তখনি করিল।
মনসার পূজা করে প্রতি ঘরে ঘরে,
হেন সংবাদ পৌঁছাইল সনকা গোচরে।
নানা রত্নে সাজাইল মনসা মূরতি,
তাহা হেরি চাঁদ হইল অতি ক্রোধমতি।

শব্দ গান

(হরিহরপাড়ার লালনগর গ্রামের নজরুল ফকির পরিবেশিত)

ও আমার জাত গেলো রে, তে জাতের সঙ্গেতে
তোরা কি পারবি যেতে এক পথে।
ও আমার জাত গেল রে, তে জাতের সঙ্গেতে।
ছয় জনা আছে খুনে, তারা সব কুটিল মনে,
তাদেরকে দুশমন জেনে চল সব এক পথে।
তাদের নাইকো আচার জাতের বিচার, জাত মেশে খুদার জাতে।
আল্লা মহম্মদ আদম তিনেতে বইছে একদম।
ধরে মুর্শিদের কদম, হওনা এখন বেজেতে।
আমার হচ্ছে সন্দ ভালো মন্দ এখন দুই হবেরে দুই জেতে।
আলেফ কয় কর্ম পূণ্য সব দেখি একই বর্ণ,
নাই কোন ভিন্ন ভিন্ন, খোওদা তালার সাক্ষাতে।
যারা জাতির বড়াই করে বেড়ায় তারা বিকোয় না এককড়াতে।

বিজয়ার গান

(১)
কি হল রে নন্দী, সতী গেল শক্তি গেল,
সতী মরল দক্ষালয়ে, শূন্য করি বক্ষ মোরে,
সেই অবধি প্রাণ মম, অন্তরে অন্তরে কাঁদে।
(২)
ও মা দিগম্বরী নাচগো,
এবার এসেছো ভবে, আবার আসিতে হবে মাগো।
ও মা দিগম্বরী নাচগো।
ও মা বন মাঝে, যেমন নাচ হরের ঘরে,
তেমন নাচ আমার ঘরে মা গো।

ছট পরবের গান

(ছট পরব উপলক্ষ্যে গঙ্গাতীরে চাঁই মেয়েরা এ গান করে। তাদের সঙ্গে সুরে সুর মেলায় বিহারী, গোয়ালা, মেথর ও রাজস্থানী মেয়েরা)

গঙ্গা নায়ারে, বাইবা জরুর, হামারি গঙ্গা মাইকে।
পেহুরি জড়াইবো, পেহেনে গঙ্গা মাইয়া।
পুলাসে লে মোরা ছাতিয়া।
হামু যে চড়াইবো পাত্তিয়া, ফুলওয়া দেব,
আরতিয়া লিহালা গঙ্গা মাইয়া।
পুলাসে লে মোরা ছাতিয়া।

পাহুর (শুকর) মারা উৎসবের গান

(জঙ্গীপুরের জোতকমল গ্রামের বিহারী গোয়ালাদের কাছ থেকে সংগৃহীত)

পাত্তা পাতা ফিরে কিষ্ট ঠাকুরকে, ডালেতে দেহাতি দোলে লোভে,
খেলিতে দোহার, সোকার ভাটা ওয়াজে। খাহিতে দেহার দূর্ব্ব সরে।
সোনাকা ভেটা তেরা নাহিলে বাগে, তোহার হক্কে হয়ে গায়ি চোরে।
ইয়াতো বচনা যশোদা শোনা লায়ে। চলিয়ারে আপনাকে ঘরে।
গাচ্ছাসে নামা মালা, কিষ্ট ঠাকুর আয়ে। ধারেক লেবে সেনা কারি বেসে।

পর্যালোচনা পর্ব ঃ

লোক সংস্কৃতির বিবর্তন ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিগত প্রায় চার দশক ধরে যারা বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত সেই সব লোকশিল্পীদের সংখ্যা কয়েকশত হবে। পেশাদার শিল্পীদের সংখ্যা শতকরা কুড়ি ভাগ এবং অপেশাদার শিল্পীদের সংখ্যা শতকরা আশিভাগ। লোক সংস্কৃতির প্রতি হৃদয়ের টান, প্রাণের আবেগ অপেশাদার শিল্পীদের বেশী। এঁরাই লোক সংস্কৃতির চালিকা শক্তি, প্রাণভোমরা। অপরপক্ষে, শতকরা কুড়ি শতাংশ পেশাদার শিল্পীরা কণ্ঠমাধুর্যে ও পরিবেশনার নৈপুণ্যে অগ্রণী। শহর ও পরিশীলিত

সমাজে লোক শিল্পী হিসাবে এঁদেরই পরিচিতি ও কদর বেশী। রেডিও, টিভির, আনুকূল্য, সরকারী বদান্যতা এঁদেরই ভাগে বেশী জোটে। বর্তমানে ঐতিহ্য অনুসারী পাল-পার্বনের সঙ্গে যুক্ত লৌকিক সঙ্গীতাদির সৃজনক্ষেত্রগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে লোক শিল্পীদের প্রবহমান ধারা বিঘ্নিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সমাজের ব্রাত্য শ্রেণীতে যাদের অবস্থান, আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা নিম্নবর্গীয়, প্রধানত তাঁরাই লোক সংস্কৃতির প্রবহমান ধারার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এই ধারা থেকে তাদের নান্দনিক প্রতিভার বিকাশ হয়। তাদের আনন্দ আহরণ এবং শিক্ষার সুযোগ লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে আসে। লোক সংস্কৃতি তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় গ্রহণ বর্জন করে থাকে। অনেক আঙ্গিক লুপ্ত হয়ে যায়, নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরে দেশের, বিশেষত জেলার আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক রূপান্তর এত দ্রুত লয়ে ঘটে যে, কৃষিজীবী এই জেলার, নিস্তরঙ্গ সহজ সুন্দর লোকজীবনের পরিচিত প্রেক্ষাপট দ্রুত পালটে যায়। প্রবহমান লোক ঐতিহ্য এই দ্রুত পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে পারে না। অনেক আঙ্গিক দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার কোন কোন আঙ্গিক সময়োপযোগী ধারায় নিজেদের পাল্টে নেয়। এ জেলার লোক আঙ্গিকের প্রাণশক্তির জোরে লোকরঞ্জন ও লোকশিক্ষার গৌরবময় ঐতিহ্য আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশ ভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু আগমন, সীমান্তে চোরাচালান, যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার, জমিদারী বিলোপ ও ভূমি সংস্কার, কৃষি ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, উন্নত জাতের বীজের উদ্ভাবন, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, সরকার ও ব্যাঙ্ক থেকে কৃষিজীবীদের আর্থিক সহায়তা, কৃষিক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, বর্গাদারী প্রথা, দশমিক প্রথার প্রচলন, সাধারণ নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন, বাৎসরিক বন্যার আতঙ্ক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার, উন্নতজাতের গরু, শূকর, হাঁস, মুরগীর পালন, কৃষিপণ্যের উৎপাদন, এ ছাড়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক প্রসার, রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ এই সকল সদর্থক ও নঞর্থক পরিবর্তনগুলি এ জেলায় লোকজীবন ও লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়েছে। গ্রামে গ্রামে হাতপুতুল খেলিয়ে বেদের দলদের দেখা যায় না। কেশেরপারের মেলায় ঝুমুরের দল আসে না। মেয়েরা পুতুল তৈরী করে পুতুলের বিয়ে দেয় না। সাঁজ পুজুনি ব্রত, পুণ্যি পুকুর ব্রত তেমন আর হয় না। ইন্দ্র দ্বাদশীর মেলায় লোক জমে না। গ্রামে গ্রামে ফিরে যে পটুয়ারা পট খেলিয়ে লোকরঞ্জন করত ও লোকশিক্ষা দিত তাদের সংখ্যা দ্রুত বিলুপ্তির দিকে।

সাতের দশকে লোকায়ত শিল্পী সংসদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পটচিত্রের ও রাইবেঁশে লোকনৃত্যের বিলুপ্তপ্রায় ধারা দুটি পুনরুজ্জীবিত হয়। বন বেড়ানো অনুষ্ঠান, ঘেটু পূজা উঠে গিয়েছে। কবিগান নতুন যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে। পৌরাণিক বিষয় ছেড়ে এখন কবিগান সামাজিক বিষয়ের দিকে বেশী নজর দিয়েছে। ছ্যাঁচরা, লেটো, কৃষ্ণযাত্রা আর তেমন দেখা যায় না। আলকাপ গান পঞ্চরসে রূপান্তরিত হয়ে আত্মরক্ষা করছে। গাজনের সময় পরিবেশিত বোলান গানের সুরে, উপস্থাপনায় বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। বোলান গান পাঁচালীর পয়ার ছন্দ ছেড়ে এখন নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছে। প্রাচীন বাউল গানের আখড়াগুলিতে গুরুবাদী ধারায় বাউল গান শিক্ষার আসর আর তেমন হয় না। তত্ত্বজ্ঞানী বাউলদের সংখ্যা কমে এসেছে। অপরপক্ষে, গায়ক বাউলদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাউলেরা জীবিকা, খ্যাতি ও অর্থের প্রয়োজনে তত্ত্বের গান ছেড়ে সামাজিক বিষয়ে আধুনিক সুরে গান করছেন। গ্রামের প্রবহমান লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলি উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সঙ্কুচিত হচ্ছে। পেশাদার শিল্পীরা শহরমুখী হচ্ছেন।

অপরপক্ষে, স্বাধীনোত্তর পর্বে, বিশেষত সাতের দশক থেকে লোক শিল্পীদের বিষয়টি নিয়ে জেলার অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ, গবেষক, সংগঠন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, আকাশবানী, দূরদর্শন, জেলা প্রশাসন, পঞ্চায়েতগুলি এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, এগিয়ে এসেছেন। জেলা প্রশাসন ১৯৭৩ সাল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় লোক সংস্কৃতির উজ্জীবনে প্রচার ও প্রসারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে। তৎকালীন জেলা শাসক শ্রী রথীন্দ্রনাথ দে, ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন.ভি.জগন্নাথনের উদ্যোগে পুলকেন্দু সিংহের পরিচালনায় ১৯৭৩ এর ২৩শে জুন বহরমপুর সার্কিট হাউসের লনে এ জেলার লোক শিল্পীদের সঙ্গীতের মনোরম অনুষ্ঠান হয়। জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিক বৃন্দ সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জেলা স্তরের লোক শিল্পীদের প্রথম অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত প্রতি বছর বহরমপুর শহরে গ্র্যান্ট হলে, বিমল কালচারাল হলে এবং অসম্পূর্ণ রবীন্দ্রসদনে এই লোক উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

সেই সাতের দশকের গোড়া থেকেই নিবিড় ও ব্যাপকভাবে জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অজ্ঞাত-অখ্যাত লোকশিল্পীদের পরিচয়ের আলোয় নিয়ে আসার পালা শুরু হয়। তার আগে ১৯৭৩ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমী গোবিন্দ বিদ্যার্থীর নেতৃত্বে এ জেলার লোক সংস্কৃতির উপকরণগুলি তথ্যচিত্রে ও রেকর্ডে নথিভুক্ত করে নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। জেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণেই তাঁরা এ জেলায় এসেছিলেন এবং জেলার আদিবাসী নৃত্য, পটের গান, বাউল ও শব্দ গান, বোলান

গান, কীর্তন গান, মনসা ও রামায়ণ গান, বিয়ের গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ থেকে রাজ্য তথ্য বিভাগের সঙ্গে সংস্কৃতির সংযোগ ঘটে এবং রাজ্য স্তরে লোক সংস্কৃতি পর্ষদ গঠিত হয়। ১৯৭৮ এর পর থেকে লোক সংস্কৃতি পর্ষদের তথা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে রাজ্য ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ও জেলা পর্যায়ে অনেকগুলি উৎসব অনুষ্ঠান সেমিনার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বহরমপুর, কান্দী, লালবাগ, জঙ্গীপুর প্রভৃতি স্থানে সরকারী লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে লোকশিল্পীরা ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এই সময় থেকেই লোকশিল্পী দলকে ও দুস্থ লোকশিল্পীদের সরকারী ভাবে অর্থ সাহায্য দেওয়া শুরু হয়। সাগরদীঘি, অর্জুনপুর, বেলডাঙ্গা, ভগবানগোলা ও সালারে সরকারী উদ্যোগে বাউল, কবিগান, আলকাপ প্রভৃতি আঙ্গিকের শিল্পীদের নিয়ে ওয়ার্কশপ হয় এবং শিল্পীদের আর্থসামাজিক এবং শৈল্পিক দিকগুলি নিয়ে তথ্যানুসন্ধান হয়। জেলার বিশিষ্ট কবিয়াল গুমানি দেওয়ানের শতবার্ষিকী উৎসবের পর থেকে তাঁর জন্ম গ্রাম জিনদীঘি গ্রামে কবিয়ালদের বাৎসরিক সমাবেশ শুরু হয়েছে রাজ্য লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্রের সহযোগিতায়।

লোকশিল্পীদের আর্থসামাজিক অবস্থা ঃ

১৯৮১ তে জেলা স্তরে সরকারী উদ্যোগে বহরমপুর শহরে জেলার লোকশিল্পীদের একটি কর্মশালা হয়েছিল। সেখানে এ জেলার কয়েকটি আঙ্গিকের লোকশিল্পীদের কাছে থেকে তথ্যানুসন্ধানকৃত কিছু তথ্যাবলী পাওয়া যায়। যদিও এই তথ্য থেকে জেলার লোক শিল্পীদের পূর্ণাঙ্গ বা সামগ্রিক অবস্থান নিরূপণ করা যাবে না, তবুও নমুনা সমীক্ষা হিসাবে এই তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় তার বিবরণ প্রদান করা হচ্ছে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ১০ জন ৯.২৫ শতাংশ ৮ থেকে ১২ মাস বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এবং ৯৮ জন ৯০.৭৫ শতাংশ শিল্পী সাময়িক ভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সারা বছর ধরে যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয় যে গুলোর মধ্যে পট গান বাদ্য, সানাই উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে শিল্পীরা সাময়িকভাবে যুক্ত থাকেন।

অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের আঙ্গিক ও শিল্পী সংখ্যা

অনুষ্ঠান/আঙ্গিক	পুরুষ	মহিলা	মোট সংখ্যা	শতকরা ভাগ
লোকগীত				
জারিগান	৫	-	৫	-
বিয়ের গান/গীত	৩	৬	৯	-
কবিগান	৯	-	৯	৩৫.৩৭
বোলান গান	৫	-	১০	-
বাউল গান	১০	-	১০	-
পটের গান	৩	-	৩	-
শব্দ গান	৮	-	৮	-
লোকনৃত্য ও আদিবাসী নৃত্য				
সাঁওতালী নৃত্য	৬	৬	১২	-
ওঁরাও নৃত্য	২	৫	৭	-
রায়বেঁশে নৃত্য	১০	-	১০	৪১.৪৮
গাজন নৃত্য	৫	-	৫	-
লোকনাট্য				
পুতুলনাচ	৯	-	৯	১৭.৫৯
কৃষ্ণ যাত্রা	১০	-	১০	-
লোকবাদ্য				
ঢোল সানাই	৬	-	৬	৫.৫৬

লোক শিল্পীদের বর্ণ, সম্প্রদায় ও পেশা ভিত্তিক বিন্যাস

বর্ণ ও সম্প্রদায়	কৃষক	বর্গাদার	ক্ষেতমজুর	শিক্ষক	ছাত্র	ছাত্রী	চাকুরী	গৃহস্থালী	শ্রমিক	শিল্পী	ব্যবসায়	বেকার	শতাংশ
তপসিলী	২	১	৪	১	৪	১	-	৩	২	-	-	২৯	২৬.৮৬
আদিবাসী	-	২	১৫	-	-	১	-	-	-	-	-	২৫	২৩.১৪
অনুন্নত	-	-	২১	-	-	-	-	১	-	-	-	২	২.৮৬
বর্ণ হিন্দু	৪	-	১	১	-	-	-	২	৭	১	-	২১	১৯.৪৪
মুসলমান	২	১	৬	-	-	১	৬	৪	৩	-	৩	৩১	২৮.৭০
খ্রীষ্টান	-	-	১১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৮	৪	-	২	৪	৩	৬	১১	১২	১	৩	১০৮	-
শতাংশ	৭.৮০	৩.৭৪	৫৪	১.৮৬	৩.৭৪	২.৭৭	৫.৫৫	১০.১৪	১১.১১	০.৯২	২.৭৭	১০০.০০	

লোক শিল্পীদের কৃষি জমির পরিমাণ (একর) অনুষ্ঠানের ভূমিকা

ভূমিকা	০.০০	০১-০৫	.০৬-৩.৩	৩৪-১	১এর বেশী	মোট	%
পরিচালনা	৩	-	-	-	-	৩	২.৯৯
অভিনয়	৭	১	১	-	-	৯	৮.৩৩
গায়ক/গায়িকা	৪০	৫	৩	২	১	৫১	৪৭.২১
নৃত্য	১৪	-	-	-	২	১৬	১৪.৮২
পুতুলনাচ	২	৪	১	-	-	৯	৮.৩৩
বাদক	১৪	২	২	-	২	২	১৮.৫৩
মোট	৮০	১২	৭	২	৭	২	১০৮
%	৭৪.০৮	১১.১১	৬.৪৮	১.৮৫	৬.৪৮	-	১০০.০০

লোক শিল্পীদের শিক্ষাগত মান

বয়স	নিরক্ষর	সাক্ষর	১ম - ৫ম শ্রেণী	৬ষ্ঠ - ১২শ শ্রেণী	তার উপর	মোট	শতাংশ
১১ - ২০ বছর	১৩	৪	৮	৬	-	৩১	২৮.৭২
২১ - ৩০ বছর	১১	৪	৮	১৩	-	৩৬	৩৩.৩৩
৩১ - ৫০ বছর	৫	৭	৬	৭	-	২৫	২৩.১৪
৫১ - ৬০ উর্দ্ধ	৮	২	৪	২	-	১৬	১৪.৮১
মোট	৩৭	১৭	২৬	২৮	-	১০৮	-
শতাংশ	৩৪.২৫	১৫.৭৬	২৪.০৭	২৫.৯২	-	-	১০০.০০

সাংগঠনিক উদ্যোগ ও লোক শিল্পীদের দেশ-দেশান্তরে অভিযাত্রা ঃ এক কালে জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর আর্থিক কাঠামো বিনষ্ট হওয়ায় গ্রাম সমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতি এদের পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। পুরাতন মূল্যবোধ নষ্ট হতে শুরু করে। কিন্তু নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় না। লোক সমাজের মননে ও শৈল্পিক কর্মে এর প্রতিফলন ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কিছু মানুষ লোক সংস্কৃতির এই শূন্যতাকে অনুভব করে তা রক্ষার বিষয়ে ভাবনা - চিন্তার শুরু করেন। জঙ্গীপুরে শ্রী বরুণ রায়, ডঃ দিলীপ ঘোষ,আব্দুর রাকিব, লালবাগের ফজলুল হক, বহরমপুরে কবি মণীশ ঘটক, অবু ঘটক, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগ্রামের ডঃ শম্ভুনাথ সরকার, জিয়াগঞ্জের সুবীর বোথরা, ডঃ শ্যামল রায়, কান্দীতে কান্দী বান্ধব সম্পাদক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ এ সব বিষয়ে ভাবনা - চিন্তা শুরু করেন। প্রায় সমসাময়িক সময়ে ছয় এবং সাতের দশকে জেলার প্রশাসনের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ লোক সংস্কৃতির বিষয়ে সচেতন হন। জঙ্গীপুর সংবাদ, জনমত, কর্ণসুবর্ণ, বালার্ক, বালুচর, কান্দী বান্ধব, বর্তিকা প্রভৃতি পত্র পত্রিকাগুলিও এ বিষয়ে কিছু লেখা প্রকাশ করে।

এই প্রেক্ষাপটে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাতের দশকের গোড়াতে গোবিন্দ বিদ্যার্থীর নেতৃত্বে সঙ্গীত নাটক একাদেমীর জেলা সফর ও তথ্য চিত্র নির্মাণ এবং জেলা পর্যায়ের লোক সংস্কৃতি উৎসবের সূচনা হওয়ায় জেলার লোকশিল্পীদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। শিল্পীদের ব্যাপকতর অনুসন্ধান, উজ্জীবন, তাদের প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং জেলার বৈশিষ্টপূর্ণ লোকসঙ্গীত, নাট্যবাদ্য, চিত্রকলা, নৃত্য প্রভৃতি আঙ্গিকগুলিকে বৃহত্তর সমাজে তুলে ধরার প্রয়োজনে এবং লোক শিল্পীদের সুসংগঠিত করার ঐকান্তিক লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে গঠিত হয় লোকায়ত শিল্পী সংসদ। কান্দীতে লোকশিল্পীদের একটি বৃহৎ জমায়েত হয়। জেলার লোক শিল্পীদের নিয়ে ব্যাপক ভাবে বহুমুখী কাজ শুরু হয়। লোক শিল্পীদের অনুসন্ধান করে তাদের গুরুবাদী ধারায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়। জেলা, রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এই সংগঠিত লোকশিল্পীবৃন্দ, জেলার নিজস্ব বৈশিষ্টপূর্ণ ঘরানাকে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন। জেলা স্তরে বিভিন্ন প্রান্তে সরকারী ও বেসরকারী লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ১৯৭৬ - ৭৭ এ কান্দীতে পটচিত্রকলা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় ধারাকে উজ্জীবিত করা হয়। বিলুপ্ত প্রায় লোকনৃত্য রাইবেঁশেকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। সাত ও আটের দশকে অনুষ্ঠিত জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই সংগঠনের লোক শিল্পীবৃন্দ

অংশগ্রহণ করে অনাদৃত ও উপেক্ষিত লোক সংস্কৃতিকে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পরিচয় করিয়ে দেন। নতুন দিল্লী, রাজস্থান, মাদ্রাজ, মণিপুর, আসাম, ভূপাল এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই জেলার বাউল গান, বোলান গান, পটের গান, কবি গান, কীর্তন গান, রাইবেঁশের নৃত্য, ঢাক-ঢোল বাদ্য প্রভৃতি আঙ্গিকগুলি সর্বভারতীয় লোক সংস্কৃতি উৎসবে এই সংসদের পক্ষ থেকে পরিবেশন করা হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে স্পেন, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবে ও অন্য উপলক্ষ্যে এই সংসদের শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। আকাশবানী ও দূরদর্শনেও এ জেলার লোক সঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকবাদ্য পরিবেশিত হয়। এছাড়াও লোকায়ত শিল্পী সংসদের বাৎসরিক উৎসবে পুরুলিয়ার সুবিখ্যাত ছৌনৃত্য, ১৯৭৬ ও পরবর্তী কালে মণিপুরী নৃত্য দলকে আহ্বান করে তাদের নৃত্য প্রদর্শন করা হয়।

আটের দশকের গোড়া থেকে পরবর্তীকালে রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদ তথা রাজ্য লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র এ জেলায় এবং জেলার বাইরে লোক শিল্পীদের নিয়ে অনেক অনুষ্ঠান করেছেন। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এ জেলার লোক শিল্পীদের শৈল্পিক ও আর্থিক উজ্জীবনে, তাদের শিল্প বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে এ জেলার অনেক লোকশিল্পী তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আনুকূল্যে অনুষ্ঠান করার সুযোগ পাচ্ছেন। ভারত সরকারের সঙ্গীত ও নাটক বিভাগ এ জেলার লোক শিল্পীদের নিয়ে সাক্ষরতা প্রসার, স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার প্রভৃতি কর্মসূচী প্রচারমূলক কাজে লোক শিল্পীদের ব্যবহার করছেন। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এ জেলার লোক শিল্পীদের আহ্বান করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়েছেন। এবং সুযোগ প্রাপ্ত লোক শিল্পীবৃন্দ দক্ষতা ও গৌরবের সঙ্গে তাঁদের শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

উজ্জীবন পরিকল্পনা ঃ গ্রাম সমাজের ঐহিত্য অনুসারী গ্রামীণ সৃজনক্ষেত্রগুলি থেকেই লোক শিল্পীদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এবং গ্রামীণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত পৃষ্ঠপোষকতায় তারা সঞ্জীবিত হন। কিন্তু সাতের দশক থেকে ক্রমবিলীয়মান অথবা স্তিমিত লোক সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করার জন্য এবং শিল্পীদের শৈল্পিক বিকাশ ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৩ সালে শ্রী পুলকেন্দু সিংহ জেলার লোক সংস্কৃতির উন্নয়ন ও প্রসার কল্পে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনায় জেলার কয়েকটি প্রান্তে বেলডাঙ্গা, সাগরদীঘি, জঙ্গীপুর, ইসলামপুর ও পাঁচথুপিতে কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়। কারণ সে সময় জেলা তথ্য ও প্রচার দপ্তরের সঙ্গে সংস্কৃতির সাযুজ্য ঘটেনি। এই সময়ই পুলকেন্দু সিংহের উদ্যোগে এ জেলার লুপ্ত প্রায় লোক চিত্রকলা পটচিত্র কলার উজ্জীবনের জন্য জেলাশাসক মাধ্যমে নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাদেমীতে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনা সঙ্গীত নাটক আকাডেমী অনুমোদন করেন। ১৯৭৬-৭৭ সালে কান্দীতে পট চিত্রকলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে লুপ্তপ্রায় পট চিত্রকলার সঙ্গে যুক্ত চিত্রকর সম্প্রদায়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পান সুদক্ষ পটচিত্র শিল্পী বাঁকু পটুয়া। তার ফলে এই চিত্রকলা পুনর্জীবন লাভ করে।

পরবর্তীকালে রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদ গঠিত হওয়ার পরে জেলা সভাধিপতির সভাপতিত্বে জেলা শাসক, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ প্রভৃতি সরকারী দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এবং জেলার সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ও লোক শিল্পীদের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি রাজ্য সরকারের লোক সংস্কৃতি কার্যাবলী রূপদানের দায়িত্ব পান। এই কমিটি জেলা স্তরে লোক সংস্কৃতি বিষয়ক পরিকল্পনা ও রচনা করেন এবং তা প্রস্তাবাকারে রাজ্য লোক সংস্কৃতি দপ্তরে অধুনা রাজ্য লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্রে প্রেরণ করে থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারের লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র জেলার লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপদান করেছেন। এই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ থেকে গৃহীত তথ্য ও প্রস্তাবগুলি বিবেচনা ও রূপদান করা হয়।

মুর্শিদাবাদের লোক সংস্কৃতির চর্চার ধারা ঃ পশ্চিমবঙ্গে সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সংগঠন, পত্র পত্রিকা লোক সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। লোক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে হান্টার, ওম্যালি প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ, তাঁদের লেখা জাতি ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত তথ্যাবলীর পাশাপাশি এই জেলার লোক সংস্কৃতির অনেক উপকরণ বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন ভাবে পরিবেশন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯০২ সালে নাগাদ প্রকাশিত 'দি হিস্ট্রি অব্ মুর্শিদাবাদ' গ্রন্থে এই জেলার ওঝাদের নিয়ে একটি চমৎকার আলোচনা আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে মুর্শিদাবাদের লোক সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রণী নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ১৯05 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লোক সংস্কৃতির সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। গ্রন্থটি এই বিজ্ঞাননিষ্ঠ অসাধারণ মানুষটির গ্রামীণ সমাজ ও লোক সংস্কৃতির প্রতি কি অকুণ্ঠ ভালোবাসা ছিল তা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করেছে। এই ব্রতকথাটি বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিনে তাঁর জেমোর বাড়ীতে মহিলাবৃন্দ পাঠ করেন ও অরন্ধন পালন করেন। এই ব্রতকথাটি ব্রতকথার আঙ্গিক ইতিহাস ও স্বদেশানুরাগকে একীভূত করেছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩০৬ সালে আষাঢ়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের 'খুকুমণির ছড়া' পুস্তকের সুদীর্ঘ ভূমিকা লেখেন। ১৩১৬ সালে কিরণবালা ঘোষ জায়া লিখিত ব্রতকথার ভূমিকাও লেখেন তিনি। কিরণবালা দেবীর নিবাস এই জেলার পাঁচথুপি গ্রামে। ১৩১৪ সালে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় কান্দীর রুদ্রদেবকে নিয়ে লেখা 'গ্রাম দেবতা' প্রবন্ধটি লোক সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সংযোজন। রামেন্দ্রসুন্দরের ঠিক পরে পাঁচথুপি গ্রামের বিদূষী মহিলা ইন্দুমতী দেবী রাঢ় মুর্শিদাবাদে প্রচলিত ব্রতকথাগুলি সংগ্রহ করে 'বঙ্গনারীর ব্রতকথা' প্রকাশ করেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে এই ব্রতকথাটি প্রকাশিত হয়। এই ব্রতকথাটির ভূমিকা লেখেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২৬শে আগষ্ট, ১৯২৬)। পরবর্তীকালে হাইনরিখ মোদে ও অরুণ রায় এই ব্রতকথাটির অংশ বিশেষ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় পুরণ চাঁদ নাহার, দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রমুখ কয়েকজন এই জেলার লোকসংস্কৃতির বিষয়ে দু-একটি আলোচনা প্রকাশ করেন এবং দীর্ঘদিন এই জেলায় লোক সংস্কৃতি চর্চায় ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি।

পাঁচ ও ছয় দশকে এই জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকায় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে লোক সংস্কৃতি বিষয়ক দু-চারটি লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালে জেলার লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলি নিয়ে পুলকেন্দু সিংহ রচিত 'মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। বাংলা ১৩৭৫, ১লা বৈশাখ 'চারণকবি গুমানি দেওয়ান' বইটি প্রকাশ করেন আব্দুর রাকিব মহাশয়। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে স্বাধীনোত্তর কালে প্রকাশিত পত্র - পত্রিকাগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে লোকসংস্কৃতির বিষয়ে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত নিরীক্ষা, বিজয় গুপ্ত সম্পাদিত গণরাজ, উমানাথ সিংহ সম্পাদিত পরিক্রমা, মনীশ ঘটক সম্পাদিত বর্তিকা, রাধারঞ্জন গুপ্ত সম্পাদিত জনমত, সুরেশ ভদ্র সম্পাদিত বালার্ক, শান্তনু ভট্টাচার্য সম্পাদিত চলন্তিকা, অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত চেতনিক, সুবীর বোথরা সম্পাদিত বালুচর, হরেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত শুভশ্রী, উৎপল গুপ্ত সম্পাদিত সাহিত্য সময়, বরুণ রায় সম্পাদিত দেহাত, প্রবীর দে সম্পাদিত মহীরুহ, দাদাঠাকুর প্রতিষ্ঠিত জঙ্গীপুর সংবাদ, প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সম্পাদিত গণকণ্ঠ, দীপঙ্কর চক্রবর্তী সম্পাদিত মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা ও মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, সত্যনারায়ন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কান্দী বান্ধব পত্রিকা ছাড়াও আবার এসেছি ফিরে, নয়াতালাশী, মুর্শিদাবাদ সন্দেশ, মুর্শিদাবাদের খবর, মুর্শিদাবাদ বার্তা, কর্ণসুবর্ণ, বোধোদয় প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলিতে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনেক মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নিখিলনাথ রায় লিখিত 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' ও 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'তে এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুর্শিদাবাদ কথা' গ্রন্থে লোক সংস্কৃতির নানা তথ্য ও কয়েকটি ঐতিহাসিক ছড়া সংকলিত হয়েছে। ১৩০৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালী একটি উল্লেখ্য আলোচনা। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কর্মসূত্রে বেশ কিছুদিন এই জেলায় ছিলেন। লোক জীবনের উপর লেখা তাঁর গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

অশোক মিত্রের সম্পাদনায় সেন্সাস দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন ও মেলা' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থটি মুর্শিদাবাদ জেলার উৎসব, অনুষ্ঠান ও মেলা বিষয়ক একটি আবশ্যিক ও আকর গ্রন্থ। ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ সালে সারগাছিতে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রানুসন্ধান হয়। সেই অনুসন্ধানে প্রাপ্ত লোকসঙ্গীতগুলি তাঁর 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। নয়ের দশকে লোকায়ত শিল্পী সংসদের সঙ্গে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কান্দী অঞ্চলে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক একটি সমীক্ষা হয় শ্রী তুষার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বরুণ চক্রবর্তী ও পুলকেন্দু সিংহের ব্যবস্থাপনায়।

বরুণ রায় সম্পাদিত জঙ্গীপুর সংস্কৃতি মেলা স্মারক গ্রন্থে (১৩৮৪) লোকসংস্কৃতির অনেক মূল্যবান আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। শ্রী দিলীপ ঘোষ লিখিত আলকাপ বিষয়ক গ্রন্থটি লোকনাট্য বিষয়ে একটি আকর গ্রন্থে। এছাড়া প্রতিভারঞ্জন মৈত্র সম্পাদিত মুর্শিদাবাদ চর্চা ও পুলকেন্দু সিংহ লিখিত 'লোকায়ত মুর্শিদাবাদ' (১৯৮৫) 'পঞ্চায়েত ও লোকসংস্কৃতি' (১৯৯৩) 'ফিরে চল্ মাটির গানে' (১৯৯৮) এই জেলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থে। শক্তিনাথ ঝা লিখিত 'মুসলিম বিয়ের গীত' 'বস্তুবাদী বাউল', 'শ্রম সঙ্গীত' ও 'মুর্শিদাবাদের বাউল ফকির ধ্বংশের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এবং সত্রাজিৎ গোস্বামী 'বহুরূপী' গ্রন্থে জেলার লোকসংস্কৃতির অনেক পরিচয় মিলবে। দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যাঁরা মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি নিয়ে লিখেছেন বা এখনো লিখছেন তাঁরা হলেন শম্ভুনাথ সরকার, শক্তিনাথ ঝা, দিলীপ ঘোষ, বরুণ রায়, আবদুল রাকিব, খাজিম আহম্মদ, কুনাল কান্তি দে, ঠাকুর দাস শর্মা, শ্যামল রায়, সুবীর বোথরা, সাধন কুমার রক্ষিত, সৈয়দ খালেদ নৌমান, শিশির কুমার সিংহ, ফজলুল হক, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, মৃন্ময় পাল, সত্যনারায়ণ ভকত, চিত্ত দাস, সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, গৌরী ভট্টাচার্য, বিজয় বন্দোপাধ্যায়, পুলকেন্দু সিংহ প্রমুখ। আরো অনেক লেখক লেখিকা তাদের চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে লেখনীর মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিন।

বিগত তিন দশকে লোকশিল্পীদের নিয়ে অনেক আলোচনা সভা কর্মশালা, সম্মেলন, মেলা ও প্রদর্শনী জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ গঠিত

হওয়ার (১৯৭৮) পর শ্রী পুলকেন্দু সিংহ দীর্ঘকাল সদস্য ছিলেন। কিছুকাল সদস্য ছিলেন শ্রী সুধীন সেন। বর্তমানে রাজ্য লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য এ জেলার মজফ্ফর হোসেন ও শক্তিনাথ ঝা। এই জেলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শক্তিনাথ ঝার নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। শ্রী ঝা তাঁর গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র হিসাবে প্রধানত এই জেলার বাউল ফকির সম্প্রদায়কে বেছে নেন এবং তিনি এদের সামাজিক ও শৈল্পিক সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আলোকপাত করেন। তিনি 'বাউল ফকির সংঘের 'অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাজ্য লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্রের একজন সদস্য হিসাবে মজফ্ফর হোসেন কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া লোকশিল্পীদের সাংগঠনিক কর্মে ও সরকারী নানান উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই জেলায় কবিয়াল গুমানি দেওয়ান কবিয়ালদের সংগঠিত করবার কাজে ব্রতী হন। পরে আট ও নয়ের দশকে সরকারী উদ্যোগে কবিয়ালদের নিয়ে সাগরদীঘি ও বেলডাঙ্গায় দুটি কর্মশালা হয়। আটের দশকে কান্দীতে লোকায়ত শিল্পী সংসদের উদ্যোগ কবিয়াল ঢুলি ও দোহারদের সুবৃহৎ সমাবেশে তাদের আর্থিক ও শৈল্পিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সংসদেরই উদ্যোগে পটচিত্রকলা শিল্পীদের আর্থ সামাজিক শৈল্পিক বিষয় নিয়ে এবং চিত্রকর সম্প্রদায়কে আদিবাসী হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নেওয়া হয় পটুয়াদের সম্মেলনে। সরকার এই প্রস্তাব মতো পটুয়াদের আদিবাসী হিসাবে গণ্য করেন।

জেলার নেহেরু যুব কেন্দ্র, ক্ষেত্র প্রচার দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, যুব উৎসব ও বইমেলা কমিটি ও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। জিয়াগঞ্জ বালুচর সংস্কৃতি পরিষদ, বেলডাঙ্গা নেতাজী পার্ক এবং পলসা পল্লী উন্নয়ন সমিতি এই জেলায় লোকসংস্কৃতি বিকাশে কিছু কাজ করেছেন। কান্দীর উপশাসক শ্রী উদয় ভাদুড়ী, শ্যামল রায়, বিমল বোথরা, রাধাগোবিন্দ ঘোষ, মনোজিৎ ঘোষ, যামিনীরঞ্জন ঘোষ, নবকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা লোকসংস্কৃতির সংগঠনিক কাজে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। এছাড়াও বিশিষ্ট বাউল সৌমেন বিশ্বাস, আলকাপ শিল্পী করুণাকান্ত হাজরা, বোলান ও কীর্তনের বিশিষ্ট শিল্পী সমাজসেবী মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, কবিয়াল দিবাকর বন্দোপাধ্যায়, বিয়ের গীতের শিল্পী আক্রমে শেখ, লোক শিল্পী আনন্দ মন্ডল, রাশিয়া প্রত্যাগত ঢোলবাদক ললিত দাস, গাজন শিল্পী অনাদি মন্ডল, মৃদঙ্গ বাদক প্রেমানন্দ বড়াল প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ তাঁদের শিল্পকর্মে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন যেমন করেছেন তেমনি এ জেলার লোকশিল্পীদের সাংগঠনিক কর্মেও ব্রতী থেকেছেন। আকাশবানী মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র স্থাপনের পর থেকে এই জেলার লোক শিল্পীরা সেখানে সঙ্গীতাদি পরিবেশনে ব্যাপক সুযোগ পাচ্ছেন। বেতার কেন্দ্রেও এ জেলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা প্রধান্য পেয়ে থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতের ভূমিকা বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই জেলায় লোক সংস্কৃতির অজস্র আঙ্গিক বিরুদ্ধ পরিবেশেও আপন প্রাণশক্তির জোরে ঐতিহ্য অনুসারী ধারায় আজও বহমান। ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, রাইবেঁশে, গাজন, গুবা ও ঘোড়া নৃত্য, কাঁথা, আলপনা ও পট চিত্রকলা, বোলান ও পাঁচালী গান, আদিবাসী লোক নৃত্য ও সঙ্গীত, আলকাপ লোকনাট্য, কীর্তন ও মনসা গান, কবি গান, বাউল ও শব্দ গান, বিয়ের গান, জারি গান, প্রভৃতি আঙ্গিকগুলি এ জেলায় ব্যাপকভাবে টিকে আছে। অনেক প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় শিল্পী এসবের সঙ্গে যুক্ত আছেন। কিন্তু বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাবে ও আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এই সকল শিল্পকর্মে ঐতিহ্য অনুসারী বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় গ্রাম সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা মিলছে না। তার ফলে কিছু পেশাদারী লোকশিল্পী শহরমুখী ও বর্হিমুখী হয়ে যাচ্ছেন। লোক শিল্পীরা জলের মাছের মতো। এঁরা সৃজন ক্ষেত্রে ও পালন ক্ষেত্রেই সজীব ও প্রাণবন্ত থাকেন। জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠলে মরে যায়। লোক শিল্পীরাও যখন অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের আকর্ষণে বহির্মুখী হয়ে যান, তাঁরা তাদের মূল শিল্প চর্চার ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেন এবং তারা শেষ পর্যন্ত শহরের কিছু সুযোগ সন্ধানীর ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হন। সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্রে কোন সংগঠন বা ব্যক্তি বিশেষ যদি লোকসংস্কৃতির জন্য ও লোকশিল্পীদের জন্য সত্যি কিছু করতে চান তবে নিরাসক্ত ভাবে ও দরদী মন নিয়ে তাদের উৎস ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করে তাদের শৈল্পিক শ্যামলিমার সজীবত্ব রক্ষা করতে হবে। লোকসংস্কৃতির সজীব অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের জীবনচর্চার, দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব নির্ভর করছে। বিশেষত ভারতবর্ষের মতো দেশে লোক সংস্কৃতির শিকড় ছড়িয়ে আছে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার গভীরে। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে একথা আরও গভীর ভাবে প্রযোজ্য। লোক সংস্কৃতি থেকে রস আহরণ করে এ জেলার সামগ্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সুতরাং তাদের উৎস ক্ষেত্রগুলিকে সঞ্জীবিত করাই আমাদের আশু কর্তব্য।

তথ্যসূত্র ঃ

সাহিত্য চর্চা ঃ

১। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

২। শক্তিনাথ ঝা, মুর্শিদাবাদের গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ‘গণকন্ঠ’ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৬

৩। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব সাধক ও সাহিত্য, গণকন্ঠ , পূর্বোক্ত

৪। বিজয় কুমার গুপ্ত, মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকজন মহিলা লেখিকা, গণকন্ঠ, পূর্বোক্ত

৫। সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসি, মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকজন মুসলিম লেখক , গণকন্ঠ, পূর্বোক্ত

৬। বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুর্শিদাবাদের দান, গণকন্ঠ, পূর্বোক্ত

৭। জয়ন্ত কুমার ঘোষাল, মুর্শিদাবাদের কয়েকজন ঔপন্যাসিক ও গল্পকার, বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ১৯৯৫

পত্রপত্রিকা ঃ

১। বংশী মান্না, ভারতীয় সংবাদপত্ররে ইতিহাস, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ৪৬

২। প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদের সংবাদ ও সাময়িক পত্র ঊনবিংশ শতাব্দী, আকাশ, বইমেলা দৈনিক, ১৬ ই মার্চ, ২০০১, বহরমপুর

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- বাংলা সাময়িকপত্র (২য় খন্ড) তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা,১৩৮৪

৪। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার- এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল, নবম খন্ড, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, দিল্লী,১৯৭৪

৫। প্রেস ইন ইন্ডিয়া ২০০০, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার, পৃঃ ১৩৯

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫

৭। গীতা চট্টোপাধ্যায় - বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ১৯০০ - ১৯১৪, পৃঃ ২৫

৮। কৃশানু ভট্টাচার্য - সাংবাদিক দাদাঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০২, পৃঃ ২৬

৯। গীতা চট্টোপাধায়- বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ১৯১৫ - ১৯৩০, পৃঃ ৩৩৮।

১০। কমল বন্দ্যোপাধ্যায় - মুর্শিদাবাদের সংবাদপত্র ও গণকন্ঠ, গণকন্ঠ বিশেষ সংখ্যা ১৯৮১।

১১। প্রকাশ দাস বিশ্বাস - মুর্শিদাবাদ জেলার দৈনিক সংবাদপত্র, আকাশ, বইমেলা দৈনিক, ১৭ ই ফেব্রুয়ারী ২০০৩, বহরমপুর।

এছাড়া ১০ই মে, ১৯৯০ ‘মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী’ প্রকাশের ১৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘ প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

লোক সংস্কৃতি ঃ

১। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার- এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল, নবম খন্ড, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, দিল্লী,১৯৭৪

২। মেজর টুল ওয়ালস্ - এ হিস্ট্রি অব্ মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট, লণ্ডন,১৯০২

৩। অশোক মিত্র (সম্পাদিত) - পশ্চিমবঙ্গের পূজা, পার্বন ও মেলা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬১

৪। অশোক মিত্র (সম্পাদিত) - সেন্সাস ১৯৫১, ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকস্, মুর্শিদাবাদ

৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য - বাংলার লোকসংস্কৃতি, এন.বি.টি.

৬। গণকন্ঠ, লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, ১৯৮৫

৭। পুলকেন্দু সিংহ, লোকায়ত মুর্শিদাবাদ

৮। পুলকেন্দু সিংহ, ফিরে চল মাটির টানে

৯। পুলকেন্দু সিংহ, পঞ্চায়েত ও লোকসংস্কৃতি

১০। জনমত, বোধোদয়, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ ইত্যাদি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা